—আড়াই টাকা—

এই লেখকের অন্যান্য বই

অ্যাল্‌বার্ট হল

অগ্নিসম্ভব

মহালয়

প্রিয়তমের চিঠি

*

অনুবাদ·

ওঅর এ্যাণ্ড পীস (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ)

আনাকারেনিনা

গ্র্যাণ্ড হোটেল

কশাক্‌স

প্রকাশক—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্‌ : কলিকাতা—১২

—:০:—

মুদ্রাকর—শ্রীপরমানন্দ সিংহরায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৭নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

রথচক্র

ভাসমান

বেলা সাড়ে তিনটা বাজলেই ছুটি হওয়ার আশায় মনটা উৎসুক হয়ে ওঠে। কিন্তু সাড়ে চারটের সময় ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে আপিসের বাইরে এসে মুখ শুকিয়ে যাওয়াটাও অনুরূপ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে মাধুরীর। এ যেন প্রথম বর্ষার জল পেয়ে পাগলের মত বেরিয়ে পড়া পিঁপড়ে। পিঁপড়ের কথাটাই মাধুরীর সর্বাগ্রে মনে পড়ে কারণ হঠাৎ ওদের ঘরের দেয়ালটা ছেয়ে যায় সারি সারি পিঁপড়েতে—অথচ এক মুহূর্তে আগেও ত দেয়ালের রং শাদাই ছিল, সেখানকার একটি বিন্দুও পিঁপড়েতে দখল করতে পারেনি। তারপর শুরু হ'ল পিঁপড়েদের এলোমেলো আনাগোনা, ঘরখানা যেন তারাই দখল করবে—সেখানে মানুষের কোন অধিকার নেই। সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাধুরী হতাশ হয়ে পড়ে, 'কী সর্বনাশ, কি উপায় হবে'!...কিন্তু যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে এসেছিল তেমনি অনাড়ম্বরেই সেই বিপুল পিপীলিকাবাহিনী কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।...তেমনি অবস্থা এই আপিস অধ্যুষিত অঞ্চলের। মাধুরী অসহায়ভাবে ট্রাম-বাসের দিকে তাকিয়ে থাকে রোজ। আজ শেষ কাজটুকু চুকতে বেলা শেষ হয়ে গেছে। কাজ শেষ করে জানালার দিকে একবার এসে দাঁড়িয়ে দেখল পথটা খাঁ খাঁ করছে। সুবোধ মাষ্টারের মত ট্রামগুলো শান্তভাবে চলেছে। সাড়ে চারটের সময়ের সেই অসংখ্য কালো মাথার একটিও দেখা যাচ্ছে না। লালদীঘির জল তিন তলার জানালা থেকে স্বপ্নসায়রের মতই হাতছানি দিয়ে ডাকে মাধুরীকে। বাস্তব কিন্তু তার চেয়েও ঢের বড় সত্য। বাড়ীতে সুন্দরলাল বসে বসে অধীর হয়ে উঠেছে নিশ্চয়, দীপ্তি বার বার খেলার ফাঁকে-ফাঁকে ঘরে এসে মায়ের খোঁজ নিচ্ছে।

দেখতে দেখতে লালদীঘির শান্ত স্থির জলরাশিকে তোলপাড় করে উঠে আসে বিংশশতকের প্রকট বাস্তব। মাধুরী আর থাকতে পারছে না। ওর মন ছট্‌ফট্‌ করছে। সাড়ে ছটা বাজতে বসেছে। মাধুরী ব্যস্তসমস্তভাবে নিজের ড্রয়ার সাম্‌নে চাবী দিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে শাড়িটা গুছিয়ে বেরুবে এমন সময় বড়সাহেবের চাপরাশী এসে খবর দিল—"সাব সেলাম দিয়া!"

বিরক্তিতে মাধুরীর আপাদমস্তক রী-রী করে ওঠে। একবার মনে হল চাপরাশীটার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়। পরক্ষণে মৃদু কণ্ঠে বলল—"বলো, কাল দেখা করব।" বলে ও খট্‌ খট্‌ জুতোর শব্দে শুদ্ধ বাড়ীখানাকে মুখর করে লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা না করে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কিন্তু পিছন থেকে বাধা পড়ল, বড়সাহেব নিজে বেরিয়ে এসেছেন—"মিসেস দত্ত, এক মিনিট যদি দয়া করে শুনে যান।"

মাধুরীর বিরক্তিব্যঞ্জক অর্ধস্বগতোক্তিটুকু বোধ হয় বড়সাহেবের কানে গিয়েছিল, তিনি বিনীতভাবেই বললেন—"না, না, আপিসের কাজ নয়, একটু চা আর কিছু মিষ্টান্ন—এই আমরা যারা এতক্ষণ খাটলাম তাদের জন্য আনানো হয়েছে। আসুন, সবাই অপেক্ষা করছে। আর আজকের দিনটাই ত—এরপর আর বলব না।"

সকলে অপেক্ষা করছে কেন? মাধুরী ত মাথার দিব্যি দেয়নি কাউকে। ওদের আর কি—কাউকে ত বাড়ী গিয়ে স্বামীর মেজাজ পোয়াতে হবে না। এ্যাংলোদের ওসব বালাই নেই। এতখানি সিঁড়ি ঠেলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না মাধুরীর, ও বললে—"অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু রাত হয়ে যাচ্ছে, আমায় মাপ করবেন।" তবুও যখন ও তরফ থেকে অনুরোধ হল—"আর কতটুকুই বা দেরী হবে। আসুন, আসুন।" তখন সাহেবের মুখের ওপর সাফ জবাব দিতেও কেমন সঙ্কোচ হল। সাধারণ ভদ্রতাবোধ ওর পথ আগলে দাঁড়াল।

অবশেষে মাধুরী যখন বাড়ী এসে পৌঁছলো তখন রাত হয়েছে। ওর চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ সুপরিস্ফুট। ট্রাম থেকে নেমে বাকী পথটুকু যেন ছুটেই এসেছে মাধুরী। গলার সরু চেন্ হারের পাশে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা, ওর শ্রান্তির

মুক্তাদানা ঝকঝক করছে। অবিন্যস্ত বেশবাসে মাধুরীর বিপন্ন বিপর্যস্ত ভাবট সুব্যক্ত। চাকুরীতে ঢুকে পর্যন্ত এতখানি রাত ও কোনোদিন করেনি। তাই আন্দাজ করতে পারছিল না অঘটনটা কি ধরনের রূপ পরিগ্রহ করবে।

সুন্দরলাল রান্নাঘরে ছিল। জুতোর শব্দ পেয়ে তিন বছরের মেয়ে দীপ্তিকে উদ্দেশ করে বলল—"ওরে চেয়ারটা এগিয়ে দে দীপু। মা মণি এসেছেন পাখা নিয়ে যা, বাতাস কর।" এরকম শ্লেষোক্তি অবশ্য আজকাল হামেশাই করে সুন্দরলাল, এসব গায়ে মাখা মাধুরীর চলে না।

দীপ্তি মায়ের ওপর অভিমান করে মনে মনে মায়ের সঙ্গে আড়ি করে দিয়েছিল। কিন্তু মাকে দেখে নিমেষে ঝড়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে মায়ের শাড়ী ধরে ঝুলতে লাগল—"তুমি এতক্ষণ আসনি কেন!"

মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে সোজা রান্নাঘরের সামনে এসে বলল মাধুরী—"এরি মধ্যে রান্না চড়িয়ে দিলে যে!"

সুন্দরলাল বামাসুলভ কণ্ঠের অনুকরণ করে বলল—"মেয়েটার খিদেতো বলে জিনিস ত আছে! আরে আমরা না হয় রাতদুপুর পর্যন্ত উপোস করে থাকতে পারি। সে যাক, এখন দয়া করে ধরাচূড়ো ছেড়ে এসো—আমার জন্যে ভাবনা অত লোক দেখিয়ে করবার দরকার নেই। ধন্য করো কিছু সেবা করে!"

অন্যদিন হলে হয়ত মাধুরী এই সামান্য কথাটা নিয়ে মাথাই ঘামাতো না কিন্তু আজ তার কাছে কথাটা খুব হাল্কা বোধ হল না। সুন্দরলালের কণ্ঠস্বরে বিষটা যেন খুবই ফুটে উঠেছিল। তবু কিছু বলল না, মেয়েকে আদর করতে করতে ঘরে গিয়ে বসল মাধুরী। সারাদিনের সঞ্চিত কাহিনী এবার হাত-পা নেড়ে দীপ্তি মায়ের কাছে ব্যাখ্যা করতে লেগে পড়ল। মাধুরী মাঝে মাঝে হুঁ-হাঁ বলে আর আপনার কাজ করে। বাইরের শাড়ীখানা কুঁচিয়ে রাখতে রাখতে মাধুরীর মনে হয় আঙুলের ডগাগুলোয় বেশ ব্যথা হয়েছে, সারাদিনের মধ্যে আজ একবারও তেমন বিশ্রাম পায়নি। তার ওপর সুন্দরলালের যা মায়ুর জন্য যে রকম ব্যগ্র হয়ে উঠেছে কি জানি আজ একটা অশান্তির সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

রান্নাঘর থেকে সুন্দরলাল হাঁকলে—"দীপু, প্লেট দিয়ে যাও। একখানা প্লেট দাও দীপু।"

সাড়ে তিন বছরের দীপুকে বাপের সঙ্গে থেকে অনেক কাজ করতে হয় তবে মা তাকে খুব ভালোবাসেন। সারাদিন পরে মাকে কাছে পেয়ে দীপু আর সবই ভুলে গেছে। তাই বাপের ওই প্রচণ্ড কণ্ঠস্বর ওর কানেই যায়নি। ও নিজের মনে বকেই চলেছিল।

পিছন থেকে এসে সুন্দরলাল দীপ্তির পিঠে গোটা কয়েক চড় বসিয়ে দিয়ে বলল—"এইটুকু মেয়ে এখনই এত অগ্রাহ্য!" তারপর নিজ হাতেই একখানা প্লেট নিয়ে চলে গেল সবেগে।

দীপ্তি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল।—কান্না বলা চলে না, আচমকা ককিয়ে উঠল—ওইটুকু একরত্তি মেয়ে ত।

ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে মাধুরী প্রথমটা বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। এক মুহূর্তের জন্য ওর পায়ের নীচের মাটি যেন দুলে উঠ্‌ল। তারপর মাধুরীর কানের পাশ থেকে আগুনের ঝাঁঝ উঠ্‌তে লাগল, সেই উত্তাপে ওর চোখ মুখ ঝলসে যাবার উপক্রম হয়। মাধুরী তবুও কোনো কথা উচ্চারণ করল না। সব বুঝতে পেরেছে ও। তাই এই দুঃসহ যন্ত্রণা উপেক্ষা করেই পরিবেশটুকু শান্ত রাখবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। সারাদিনের ঠক্‌-ঠক্‌ খটা-খট টাইপরাইটারের ঝালাপালা এখনও কানে বাজছে যেন। তার উপর নূতন করে হট্টগোলকে আমন্ত্রণ করার উৎসাহ নেই ওর। একটু চুপচাপ ঝিম-ঝিম নিঝুমতার জন্য উন্মুখ।

বাথরুম থেকে স্নান করে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে বেরুলো মাধুরী। মনটা! কিন্তু ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক নিয়মে রীতিমত ধূমায়িত হয়েছে। সত্যিই ত এভাবে ওইটুকু দুধের বাছাকে চোরের মার মারবার কি সার্থকতা আছে? সুন্দরলালের এ শাসনের অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। মাধুরী কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করবে না এরকম দুর্ব্যবহার। এ যেন মাধুরীকে শাস্তি দেওয়ার চেয়েও সাংঘাতিক, যাকে আক্রোশের নিষ্ঠুর আক্রমণ বলাই ঠিক।

স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে মাধুরী মেয়েকে কোলে নিয়ে ঘুম পাড়াতে বসল।

সুন্দরলাল রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল—"এখন চা জলখাবার খাবে, না, একেবারেই রাত্রের পর্ব শুরু করবে?"

মাধুরী বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করে—"ক'টা বেজেছে যে এরই মধ্যে শেষ খাওয়া খেতে হবে?" এবারে ওর কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা ছিল।

সুন্দরলাল আরও সরলতার ভাণ করে বলে—"রান্নাঘরের জানলা দিয়ে চাঁদের চেহারা দেখে অনুমান হয় ন'টা।"

"না, এখন আটটা বেজে তিন মিনিট। আমি বাড়ী এসেছি সাড়ে সাতটার সময়—"

"তা হ'লে চা আনি।"

"থাক তার দরকার নেই, আমি চা-খাবার খেয়েছি।"

"সেটা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। তা রাত্রের পাটও চুকিয়ে এলেনা সেখান থেকে?

"তোমার অনুমানের বহর দেখে ভয় হয়। শুধু এক কাপ চা, দুটো সিঙ্গাড়া, দুখানা কচুরী আর সন্দেশ।"

"না তা নয়, আমার কল্পনাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি এতদিন বেশ চালিয়েছ; এখন একটু হাল্কা ভাবে সিঙ্গাড়া কচুরী দিয়ে শুরু হচ্ছে—এরপর চপ্ কাট্‌লেট, রাত আরও বেশী হবে। আমার কথাগুলো তখন আরও বেশি বিরক্তির মনে হবে। এইসব দেখবার জন্যেই কি আমি হাঁড়িহেঁসেলের ভার তোমার হাত থেকে তুলে নিয়েছিলাম?"

মাধুরী শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, "কেন মাসের পয়লা তারিখে ষোল আনা মাইনেটা পাই-পয়সা হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দিই না?"

"উঃ, ওই পয়সার জুতো আর কতো মারবে? শুধু কি পয়সাটাই চেয়েছি আমি?"

"কিন্তু পয়সা চাইলে বিনিময়ে কিছু প্রতিদান করতে হয়; এতখানি বয়সে সেটা তোমার বোঝা উচিত।"

"নতুন করে তোমার কাছে বোধোদয়ের পাঠ নিতে হবে দেখছি। আপিসের সময় সাড়ে-চারটে পর্যন্ত। না হয় ধরলাম দু'পাঁচ মিনিট, কি, আধঘন্টা দেরি হোক, চেষ্টা করলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে বাড়িতে আসা যায়। আজ তোমার এই রাত দুপুর পর্যন্ত বাইরে কাটানোর মূলে কি আছে আমার জানবার উপায় নেই। তুমি যা বলবে তাই মেনে নিতে আমি বাধ্য। সে যা-ই হোক এভাবে এ সংসার চালানো আমার পক্ষে অসম্ভব—এই জেনে তুমি যা-খুশি তাই করো।" ব'লে সুন্দরলাল কাঁধের গামছাখানা হাতে নিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে লাগল। তার চুলগুলো এলোমেলো ভাবে কপালের উপর এবং চোখ ছাড়িয়ে নাকের কাছ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ে ছিল,—একটা ঝাঁকানী দিয়ে সেগুলো স্বস্থানে প্রেরণ করে সুন্দরলাল পূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকে। সুন্দরলালের বলিষ্ঠ পেশীবহুল বাহু দুটো যেন শক্তি এবং সহনশীলতার প্রতীক। তার চেহারা দেখলে বুঝতে পারা যায়, যদিও গায়ে জোর আছে তবু সেটার অসদ্ব্যবহার হবে না কোন দিন।

মাধুরীর মনে হয় সুন্দরলাল ওকে যেন খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। এই লক্ষ্য করার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা রয়েছে—সে ইঙ্গিতটা খুব ভদ্র রুচিসঙ্গত নয়। তবে কি সুন্দরলাল কিছু না বুঝেই, কিছু না জেনেই অমূলক সন্দেহের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত! কথাটা মনে হতেই মাধুরী ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে পাগলের মত হয়ে ওঠে, ও বলে—"তুমি জানলে না, শুনলে না—এমন কি জিজ্ঞাসা করাটাও দরকার মনে হ'লো না তোমার। নিজের খুশিমত একটা কথা কল্পনা ক'রে নিয়ে মিথ্যে অপমান করতে চাও।"

"অপমানটা মিথ্যে কারণে হ'লে তা অতি সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তোমায় বিচলিত দেখছি যেন।" সুন্দরলালের কণ্ঠস্বর গভীর কিন্তু তারই অন্তরালে একটা বিদ্রূপের হাসি উঁকি দিয়ে গেল।

মাধুরী আরও অধীরভাবে ঝাঁঝালো মেজাজে জবাব দিল—"তোমার অধঃপতনে বিচলিত হয়েছি।—অপমানের কারণটা মিথ্যে হতে প্যারে কিন্তু এই আলোতে তোমার মনের পরিচয়টা ত ভুল নয়।"

"অধঃপতনটা অনেক আগেই হয়েছে। নইলে তোমার সংসারে হাভাবেড়ী আশ্রয় করব কেন?"

"সংসার শুধু কি আমারই—তোমার কিছু নয়! সারাদিন এই হাড়ভাঙা খাটুনীটা কেবল আমার নিজের জন্যেই বুঝি খেটে মরি! মনে ছিল না? সেধে সেধে চাকরী করতে পাঠিয়েছিলে যখন!"

"তখন তোমায় চিনতে পারিনি, অথবা বলতে পারো নিজেকে বুঝতে শিখি নি!"

"ছি, ছি, ছি! ওইটুকু একফোঁটা মেয়েকে এমন মার মারলে—মেয়েটা যে আর একটু হ'লে অজ্ঞান হয়ে পড়ত। এতটা বর্বরতা তোমার কোথা থেকে এলো!"

"আমি অমানুষ, আমি নীচ, আমি বর্বর আরও কিছু বলবার থাকে ত শেষ করে নাও। এরপর আর সুযোগ দেব না।"

"বলব বই কি। একশ বার বলব। যে পুরুষ মানুষ হয়ে ঘরে বসে থাকে সে আবার অত মেজাজ দেখায় কি সুবাদে।"

সুন্দরলালের পেশীগুলো সাপের মত নেচে উঠ্‌ল, হাত দু'খানি অস্থিরভাবে শূন্যে ছুঁড়তে লাগল সে। নিজেকে সম্বোধন করে বলল, "শান্ত হও, শান্ত হও নারী অবলা। হুঁসিয়ার, শেষ কালে ভ্রান্তির কলঙ্ক কিনো না।" তারপর মাধুরীর দিকে তাকিয়ে সে বলল—"তোমার পয়সার গরম আর সহ্য হচ্ছেনা না। আমায় ছুটি দাও।"

মাধুরীর মন যেন অনির্বাণ বিদ্বেষে জ্বলে উঠেছে, ও বলল, "আমি ছুটি দিলে তোমার পরিবারের দৈনন্দিন খরচের ব্যবস্থা কি হবে? সেটা ভালো করে ভেবে দেখেছো। এই রোজগারের ঘানিগাছ থেকে অব্যাহতি পেলে আমি ত বাঁচি। এদিকে বড় বাবু, ওদিকে বড়সাহেব, হরদম সেলামের গুঁতোয় প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। তবে হ্যাঁ তারা এরকম চোখ গরম করে না এই যা রক্ষে। নইলে কবে ইস্তাফা দিয়ে পালাতাম।"

"তাহলে আমার সংসারের চেয়ে আপিস ঢের আরামের আড্ডা, না কি, বলছ?"

একথায় মাধুরী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—"সে কথা আবার জিজ্ঞেস করছ। এখান চেয়ে পৃথিবীর যে কোনো জায়গা ভালো।"

"কিন্তু আমারও আর সহ্য হচ্ছে না। এবারে একটা কিছু করা দরকার।" বলে ঘাড়ে গামছাখানা রাখল সে।

"সেতো অনেকদিনই শোনাচ্ছ। কাজের বেলায় ত কিছু দেখি না।"

"কাল থেকে তুমি বাড়ি থাকবে আমি কাজের খোঁজে বেরুবো।"

"ওঃ, খোঁজ করতে বেরুবে বলে আমায় বেকার বসে থাকতে হবে। কেন?"

"যে জন্ত আমি থাকি।"

"তোমার কাজ নেই বলে—কিন্তু আমার ত তা নয়। তাছাড়া শুধু কাজ খোঁজাতেই ত পয়সা আসে না। তিন তিনটি প্রাণীর অন্নসংস্থানের একটা কোনো ব্যবস্থা থাকা দরকার এটা ত বোঝো।"

বারবার সেই পয়সার ইঙ্গিত। সুন্দরলাল আর ধৈর্য রাখতে পারে না। সে ক্ষিপ্রপদে মাধুরীর মুখের সামনে এসে দাঁড়ালো।

এরপর সে কি করবে তা মাধুরী একাধিকবার জেনেছে। ভয়ে ওর চোখ বুজে আসে, মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। ওই লোহার মত কঠিন হাত দু'খানা দিয়ে সুন্দরলাল ওর গলা টিপে ধ'রে কয়েকবার ঝাঁকানি দিয়ে চেয়ারের ওপর বসিয়ে দেবে। উঃ কি কঠিন হাত। যন্ত্রণার আশঙ্কায় ও চীৎকার করে উঠল, "সাবধান।" কিন্তু মিনতির বদলে ওর কণ্ঠে যেন একটা কঠিন আদেশের ইঙ্গিত বেজে উঠল। সুন্দরলালও কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটস্বরে কী যেন বলল সে, মাধুরী বুঝতে পারল না। ভয়ে আপনা আপনিই ওর দুচোখ বুজে গেল। চোখ বুজেই ও প্রতীক্ষা করে রইল সেই লৌহকঠিন হাতের শ্বাসরোধকারী বেষ্টনের জন্য।

কিছুক্ষণ পরে মাধুরী বুঝল আজ আর সুন্দরলাল ওকে কিছু বলবে না।

এইভাবে ক্রোধ সংযত করার শক্তি সুন্দরের স্বভাবে ইতিপূর্বে ত মাধুরী দেখেছে ব'লে মনে পড়ে না। মাধুরী বিস্মিত না হয়ে পারে না।

মাধুরী চোখ মেলে চেয়ে দেখল সুন্দরলাল ঘরে নেই। বাইরের একফালি বারান্দায় ভারী পায়ের আওয়াজ পেয়ে বুঝল সুন্দরলাল পায়চারী করছে

যুদ্ধে জয়লাভ করেছে মাধুরী। সেজন্য খুশি হবারই কথা। কিন্তু কি ·· একটা শূন্যতার ওর মনের মধ্যে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতে লাগল।

বাইরে এসে মাধুরী বলল—"তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে।"

"রাগ? কেন!" সুন্দরলাল বলল।

কিন্তু মাধুরী যেন বিশ্বাস করতে পারে না। এ যেন কোন দূরান্তর থেকে অপরিচিত কেউ রীতিমত সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কইছে। এতক্ষণের তীব্র বিষ-জর্জর মনটা মাধুরীর কি এক অজ্ঞাত কারণে করুণারসধারায় সিক্তিত হয়ে উঠল। ও সুন্দরলালের একটি হাত ধরে বলে—"শুধু শুধু তুমি আমার ওপর রাগ করছ। শোন না, আজকে বাড়িতে পা দিয়ে অবধিই কেমন বাঁকা বাঁকা কথা বলতে শুরু করলে তাতেই ত আমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেল।"

সুন্দরলাল বলল—"বেশ ত! আমি আমার সব অন্যায় স্বীকার করে নিচ্ছি। তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ।"

মাধুরী ভেঙ্গে পড়ল—"তুমি কি এতটুকু শান্তি দেবে না!"

সুন্দর উদাসভাবেই বলতে লাগল—"আমার অধিকার কতটুকু, আমার কি বা শক্তি আছে? আমি শুধু দাসত্বের ভাগী।"

"এর চেয়ে গলা টিপে মেরে ফ্যালো আমায় ছি, ছি, ছি!"

"ছি, ছি, ও কথা বলতে নেই। সাবধান হয়ে এক পাশে চলতে হবে আজ থেকে। তোমার এ সতর্কবাণী বেদের মত হয়ে থাকবে।"

সুন্দরলালের এক একটি কথায় মাধুরীর শ্রান্ত শিথিল দেহের শিরাধমনীগুলো যেন অবশ হয়ে আসছিল, এমন সময়ে রান্নাঘর থেকে পোড়া ভাতের চিমসে গন্ধ নাকে এসে লাগতেই মাধুরী যেন স্প্রিং-এর দম দেওয়া খেলনার মত ছুটে চলে গেল।

তাড়াতাড়ি হাঁড়িটা উনুন পাড়ে নামিয়ে রাখল মাধুরী। উনুনটা গন্ গন্ করছে আঁচে। একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, রান্নার আর কিছুই বাকী নেই। আস্তে আস্তে উনুনটা খুঁচিয়ে দিয়ে সেখানেই মাধুরী বসে রইল।

মাধুরী ভুলে গেছে সব কিছু। একটা শূন্য নির্লিপ্ততায় ওর মনটা কোথায়

হারিয়ে গেছে। কি যেন নেই, কিছু একটা চাই—এমনি একটা বোবা বেদনায় হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

পোড়া ভাতের উগ্র গন্ধটা ক্রমশঃ কমে যায়। উনুনটা নিভে ছাই হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে। সুন্দরলালের সুপ্ত বিদ্রোহ যেন গ্রাস করতে আসে, সমগ্র পৃথিবীর বিদ্বেষ ওর মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে দেখা দেয়। এই বিদ্বেষ প্রথমে ছিল উগ্র এবং তীব্র—এখন যেন দিন দিন ব্যর্থ আস্ফালনের মত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মাধুরী কোনটাই চায় না। সুন্দরলালের এই খর্বতাটুকু যেন বড় বেশী করেই ধরা পড়ল আজ। এ কী! সুন্দরলাল ছোট হয়ে যাচ্ছে কেন মাধুরীর চোখে। না, না, এ অসহ্য। তবে মাধুরী কি চায় যে—সুন্দরলালের সেই পুরাতন অঘটনের নেশায় সে খেলনা হয়ে থাকবে? অথবা বাইরের জগতকে জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহকোণে নিরিবিলি আশ্রয় নিতে চায়। এর সহজ জবাব নেই—তবে এটা ঠিক যে, বর্তমানকে অস্বীকার করতে চায় মাধুরী। আরও একটু বেশী জানে ও—বর্তমানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আজ থেকে সাতমাস আগে শুরু হয়েছে ওদের নূতন করে জীবনযাত্রার গতিটা পাল্‌টে নেওয়ার পর্ব। তার আগে এককালে মাধুরী কুমারী জীবনে চাকরী করেছিল যুদ্ধের সময়, সেটা সখের বশেই খানিকটা। সখ ছিল আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার। এবারে কিন্তু সেই সৌখীনতার অভিজ্ঞতার ওপর প্রয়োজনের টান পড়ল।

সুন্দরের চাকরী চলে যাওয়ার পরে সে যখন দিশাহারা শূন্যে অসহায়ভাবে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন মাধুরীর হঠাৎ মিলে যাওয়া চাকরীটা যোগাড়ের মূলেও সুন্দরলালই ছিল। অর্থাৎ সুন্দরই এসে একদিন বলেছিল—"আমার কপালে আর কাজ জুট্‌বে ব'লে আশা হয় না। এখন তোমার দৌলতে যদি খেয়ে বাঁচি সে আশা দেখছি হাতের গোড়ায়।"

মাধুরী যেন অন্ধকারে আলোর রশ্মি দেখতে পায়, "সে আবার কি গো?"

"একটা মার্চেন্ট অফিসে টাইপিষ্টের চাকরী খালি হচ্ছে।"

"কিন্তু আমি যে ছাই সব ভুলে খেয়ে বসে আছি।"

"সেজন্যে ভাবনা নেই যদি রাজী হও, শিখিয়ে দেবো।"

তারপর কোথা থেকে একটা আধভাঙ্গা রেমিংটন মেসিন এনে সুন্দরলাল র মাষ্টারী সুরু করল এবং একদিন মাধুরী চাকরী করতে হাজির হল অফিসে। বারে সখের চাকরী নয়, অন্ন-সংস্থানের প্রয়োজন।

সুন্দরলাল মহা উৎসাহে বলল—"জয় বিংশ শতাব্দীর। আমি তোমার হকার্যভার করিনু গ্রহণ।" সেদিনের সুন্দরলাল সত্যই পুরুষোচিত কণ্ঠে ধুরীকে উৎসাহ দিয়েছিল।

যদি বা মাধুরী সকালে উঠে উনুন ধরিয়ে রান্নার যোগাড় করতে যেতো ন্দরলাল মহা-সন্ত্রাসে ওকে সেখান থেকে হঠিয়ে দিয়ে নিজেই রন্ধনশালা দখল রত। এমনি করেই দিনে দিনে মাধুরীও ওদিকের ভার ছেড়ে দিয়েছিল সুন্দর-লের হাতে। প্রথম প্রথম বেশ নূতন নূতন ছন্দে চলেছিল কিছুদিন।

কিন্তু আজ সে সব কথা বোধহয় সুন্দরলাল ভুলে গেছে। তার শুধু মনে ছে সংসারের সব বোঝাই সে বহন করছে।···

মাধুরী আপন মনে ভাবছিল। কিছুক্ষণের জন্য ওর চোখের সামনে থেকে বর্তমানের এই রান্নাঘর, এই বাড়ী সব কিছু মুছে গিয়েছিল, হঠাৎ সেখানে সুন্দরলালের ভারী পায়ের আওয়াজের আঘাতে সেই বাস্তব আবার ফিরে এল। মাধুরী মুখ তুলে তাকাল।

মাধুরী কতকটা অপ্রতিভভাবেই বলল—"না, এই এমনি বসে আছি।"

ওর স্বাভাবিক সহজ কণ্ঠস্বরে হয়ত নিস্পৃহতা ছিল। সুন্দরলাল সেটার অন্য অর্থ করে নিল—"অর্থাৎ বাড়ীতে যেটুকু সময় দয়া করে থাকবে সেটুকুও এড়িয়ে চলতে চাও।"

মাধুরীর বিস্মিত হবারই কথা, ও বললে—"না, না, এমনি-বসে বসে ভাবছিলাম।"

"ভাবছিলে কি, সেটাই যে আমার ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"সুখ-দুঃখের কথা, তোমার কথা, আমার কথা, দীপ্তির কথা।"

"আর কোনও কথা নয়?"

সুন্দরলালের কথার ইঙ্গিতটা এবারে যেন খানিকটা স্পষ্ট। মাধুরীর মনের

মধ্যে একটা বেদনা গুমরে উঠছিল। মাধুরী বলল—"হ্যাঁ, যদি ভাবিই তাহলে কি করবে?"

"তাহলে নতুন ক'রে তোমার কাছে আবেদন করব, তোমাদের অফিসে আমার একটা চাকরী জুটিয়ে দাও, এই ব'লে। অবিশ্যি এর আগেও তোমায় বলেছিলাম সুপারিশ—!"

"বলো আরো কি কি বলবে,—শুনে যাই। তোমার কল্পনার দৌড়টা দেখি। তার আগে একটা অনুরোধ আছে—স্নান ক'রে ঠাণ্ডা হ'য়ে বসলে পারতে। অনেক কচ্লানো তো হ'ল। অপরাধের মধ্যে এই হয়েছে যে, সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় বাড়ী ফিরেছি—তাও দেরিটা আফিসের দাসত্ব মেটোবার জন্যেই। তবে হ্যাঁ একটু বেশী অন্যায় হয়েছে, মানে, ওই তারই মধ্যে ভদ্রসমাজে বসে একটু চা-ও খেয়েছি। একশ'বার অপরাধ এটা। আমার তো শুধু ঘানিগাছে ঘোরবার অধিকার আছে, এছাড়া একটু দম নিয়ে জীবনটার অস্তিত্ব বোঝবার অধিকার থাকাটা তো লিখে দাও নি। আচ্ছা আজকের মত মাপ করো—কাল থেকে এক পা-ও তোমার অনুমতি ছাড়া এ দাসী চলবে না হুজুর।" বলতে বলতে মাধুরীর চোখের কোল বেয়ে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল —"জীবন তো নয়, জঞ্জাল।"

মাধুরীর এ অশ্রু সুন্দরের উত্তপ্ত-অন্তরে কি-একটা মোহের স্পর্শ সঞ্চার করে। সে বলে—"কথা তো তা নয়। বাড়ীতে পা দিয়েই এমন ভাবভঙ্গী করলে যেন দিগ্‌বিজয় করে এলে। একবারও কি ভাবো যে আমি একটা মানুষ খোঁয়াড়, খাঁচে অস্থির হ'য়ে থাকি। এই যে সেদিন তোমাদের আফিসে একটা করেস্‌পনডেন্স ক্লার্ক-এর চাকরী খালি হ'ল, তুমি তো আমার জন্যে সেটা চেষ্টা করতে পারতে। আর বড়সাহেব তোমার কথা রাখেন—আমি জানি। কিন্তু সেদিকে একবার ভাবও না তুমি, নইলে বড়বাবুর সেই ভায়ের চাকরী হ'ল আর আমার হ'তে পারত না?"

"আমি বড়বাবুকে বলেছিলাম তো।"

"সাহেবকে তো বলো নি!"

"আমি কি. তা বল্‌তে পারি? আর আমার সঙ্গে তাঁর তেমন আলাপও নেই যে—"

বাধা দিয়ে সুন্দর বল্‌ল—"তেমন আলাপ থাকবে কেন—অরে এমন আলাপ আছে যে তাঁর সঙ্গে বসে টি-পার্টি করো তুমি। এসব বুঝতে বাকী নেই।"

"কি বুঝলে আবার?" মাধুরী যে কথাটা বলতে চায় সেটা কিছুতেই ওর মুখে আসছে না।

"বুঝলাম যে আমার সঙ্গে এক আপিসে চাকরী করা তোমার পক্ষে অসুবিধে সেইজন্যে দরখাস্তটা চেপে দিয়েছিলে।"

আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করে না মাধুরীর, ও উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"বেশ করেছি।"

মাধুরী একেবারে বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসল। আর একটি কথা কইবে না মনে মনে সংকল্প করল।

রাস্তার আলোয় দেখা যায় একখানা রিক্সা ঠুং ঠুং শব্দ করে বাঁক নিয়ে এইদিকেই আসছে। পাশের বাড়িতে রেডিও বাজ্‌ছে ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ করে। কি জানি আজকাল রেডিওর আওয়াজ কানে গেলেই মাধুরীর মনে হয় ঘ্যান্‌-ঘ্যান্‌ কান্না কে কাঁদছে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠ্‌ল দীপ্তি—"উঃ আর মেরো না বাবুজী! না, না, না!" দ্রুতপদে উঠে গিয়ে মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল মাধুরী। মেয়েকে আদর করতে করতে কখন যে ওর শ্রান্ত দেহখানায় ঘুম নেমে এল—

রাত্রি গভীর হয়েছে। সুন্দরলালের ডাকাডাকিতে মাধুরী বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর ওর মনে পড়ে গেল সব কথা। এই একটু আগের ঘটনা, কিন্তু ঘুমের আড়ালে পড়ে সেটা যেন স্মৃতি হ'য়ে থিতিয়ে গেছে। ওর মনে সে উত্তাপ নেই। ও বল্‌লে—"ক'টা বাজলো?"

"সাড়ে এগারটা।"

"ইস্‌ বড্ড রাত হ'য়ে গেছে। তুমি কেন এতক্ষণ ডাকো নি।"

সুন্দরলাল শান্তভাবে বলে—"একটু বিশ্রাম করছ।"

মাধুরী রান্নাঘরে গিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়তে বসল। হাঁড়ির ভাতগুলো

সাবধানে ওপর-ওপর তুলে সুন্দরলালের থালায় রাখল। আর নীচে যেগুলো চাপড়া ধরে গিয়েছিল সেটা বাদ দিয়ে লাল লাল খানিকটা দলা পাকানো ভাত নিজের জন্য রাখল মাধুরী।

সুন্দরলালের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ক্ষীণ হাসি বিদ্যুৎ ঝলকের মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। একটা কথা ওর মুখের ডগায় এসে শুদ্ধ হ'য়ে গেল—ওর ইচ্ছে হ'ল বলে—"ওপরের ভাতগুলো যে আজও আমাকেই এগিয়ে দিচ্ছ?" কিন্তু অতিকষ্টে এই কঠিন রসিকতার লোভটুকু সম্বরণ ক'রে মুখ বুজে ভালো ভাতগুলোই খেতে সুরু করল। অন্যদিন হ'লে সে ভালো এবং পোড়া ভাতটা ভাগাভাগি ক'রে নিত। আজ আর তা করল না। এটা ইচ্ছাকৃত নয় তার।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় মাধুরী বলল—"কাল আপিস থেকে ফিরে তোমায় অনেকগুলো টাকা দেবো বুঝলে?"

সুন্দরলাল অবাক হ'য়ে তাকালো।

তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে মাধুরী বলল—"আজ থেকে আমার আর চাকরী নেই। এক মাসের মাইনে মিটিয়ে দেবে কাল। আমাকে বিদায় দেবার জন্যেই আজ ছোটখাট পার্টির আয়োজন করেছিল আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই মিলে।...কথাটা বলি বলি ক'রে এতক্ষণ বলতে পারি নি। তুমি ভেবো না কিছু। টাইপিষ্টের কাজ বিস্তর পাবো।"

মাধুরীর কথাগুলো সুন্দরলাল যেন বিশ্বাস করতে পারে না। তবে অবিশ্বাস করবারও কিছু নেই, তবু বললে—"যাঃ, সত্যি বলছ।"

"হ্যাঁ গো! তবে এতে ঘাবড়াবার কি আছে, টাইপিষ্টের চাকরীর অভাব কি! একটা গেল, আর একটা হবে।"

অমর

অমরেশ কোন কালেই অপরের মুখ চেয়ে চলে না। যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কথা বলা তার অভ্যাস নেই। টাকা আনা পাই-এর বাঁধানো পথ ধরে তার হিসাব-নিকাশ স্বচ্ছন্দগতিতে চলে। অর্থাৎ দাদা যদি বলেন—"কেমন আছিস? মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে?" তার জবাবে অমরেশ বলে—"না, চাকরি যায় নি। তবে এখুনি যদি দশ বিশ টাকা চেয়ে বসো তাহলে নাচার—ধার করে দিই এমন বন্ধু নেই।" শুধু দাদা বলেই নয়, আত্মীয়-স্বজন যে-কেউ তার দিকে এতটুকু মনোযোগ দিলেই অমরেশ এই ধরনের কথাবার্তা বলে। এই আচরণে যে কেউ ব্যথিত হতে পারে, সে কথা অমরেশ একেবারে অবিশ্বাস করে। ছেলেবেলা থেকেই তার নিজের ওপর একক বৈশিষ্ট্য আরোপ করে চলা অভ্যাস, ফলে সেটা তার প্রকৃতিতেই রূপায়িত হয়েছে। কোনোরকমের মুখোশ পরা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই বোধহয় সে আপনার লোকের কাছে অপ্রিয় এবং নিঃসম্পর্কিতের আসরে পরমাত্মীয়।

কিটি স্মিথ মনিবের চাকরী করলেও অমরেশের অধীনেই তাকে থাকতে হয়। অমরেশ হচ্ছে মেজর রামজীবন চৌধুরীর সেক্রেটারী, কিটি স্মিথ স্টেনো টাইপিষ্ট। আজ অমরেশ হল-ঘরে বসে আছে। কিটি নিরুপায়ভাবে বসে বসে উলের মোজা কিম্বা ওই রকম একটা কিছু বোনে। অমরেশ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিঠিপত্রগুলো উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে কিটির দিকে না তাকিয়েই বলে, "প্লিজ টেক ডাউন।"

আজ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে।

অমরেশ চেয়ারে নিশ্চলভাবে বসে মনে মনে যথেষ্ট অস্থির এবং বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এখানকার কাজ সেরে তাকে খবরের কাগজের আপিসে যেতে হবে, প্রথমত দুটো তিনটে 'প্যারা' লিখতেই হবে সেখানে। অবশ্য সমস্তই রাজনীতিমূলক।

মেজর চৌধুরীর সঙ্গে চুক্তি দু'ঘণ্টার, আসলে সে কাজ করে আধঘণ্টাখানেক। বাকী সময়টা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। মেজর চৌধুরী এক-একদিন মৃদু হেসে বলেন, "অমরেশ-এর বৈঠকখানাটি বেশ।" অমরেশ কোনো জবাব দেয় না বাজে কথা বলা তার স্বভাব নয়।

আজ কোনো বন্ধুও আসে নি। অমরেশ একেবারে বেকার। চিঠিপত্রের গুচ্ছ যেমন সাজানো থাকে তেমনই সাজানো রয়েছে। কিটি স্মিথ এবে তারপর ওগুলোতে হাত দেবে সে—এত আগে থেকে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই।

হঠাৎ স্প্রিং-এর মত দরজাটা দুলে উঠতেই অমরেশ এতক্ষণের রুদ্ধ অসন্তোষ সবেগে ব্যক্ত করল। তার ইংরেজি উচ্চারণ এবং শব্দ নির্বাচন হুবহু ইংরেজেরই। দরজার দিকে না তাকিয়েই সে ইংরেজিতে বললে, "যাক আপনার ফুরসৎ হ'ল! এভাবে সাতটা চাকরী সামলাতে গেলে কোনটাই হয় না মিস্ স্মিথ! এবার দয়া ক'রে কাজে হাত লাগান্। আমার আর সময় নেই।"

অপর পক্ষের কোনো সাড়া না পেয়ে অমরেশ ত্বরিতে ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়ে দেখল কিটি স্মিথ নয়, মেজর চৌধুরী নিজেই, ড্রেসিং গাউন পরে, ওষ্ঠ প্রান্তে মোটা চুরুটের ডগায় অনেকখানি ছাই জমে ধূসর হয়ে রয়েছে আগুনের কোনো চিহ্ন নেই—না চুরুটে, না মেজর চৌধুরীর চেহারায়।

অমরেশ মোটেই খুশী হয় নি মনিবকে দেখে। তার বিরক্তি গোপন থাকে না।

কিটি স্মিথকে দেখেও অমরেশ কোনদিন বিন্দুমাত্র প্রসন্ন হয় না। মেজর চৌধুরীকে দেখেও বিরক্ত হওয়ার সঙ্গত কারণ কিছু নেই। একমাত্র এই হ'তে পারে যে, কিটি স্মিথকে সে চিঠি পত্রের জবাব বলে দিয়ে দায়মুক্ত হ'তে পারত, মেজর চৌধুরী হয়ত নতুন কিছু ফরমাস নিয়ে হাজির হয়েছেন

মেজর চৌধুরীকে দেখে অমরেশ একটু উঠে দাঁড়িয়ে আবার ব'সে পড়ল, ছোট্ট নমস্কার সেরে। আর তার মনিব প্রতিনমস্কার করে স-কলরবে শুরু করলেন, "Excuse me. আমি তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে একটা ট্রেঁ নিয়েছি অমর।"

অমরেশ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, মেজর চৌধুরী কথাটা বলতে বলতে থেমে গেলেন। তারপর কতকটা স্বগতভাবেই শুরু করলেন, "অবিশ্যি এ নিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করার কিছু ছিলও না। ইয়ে, তোমার দু'চার দিন একটু অসুবিধে হবে, তবে আবার নতুন লোক এসে যাবে এর মধ্যে।"

অমরেশ বললে "স্মিথ কি চাকরী ছেড়ে দিয়েছে না কি?"

"না, আমি তাকে আর আসতে বারণ করেছি।"

"হঠাৎ তাকে বরখাস্ত করাটা ঠিক হয়নি। She is a precious girl".

"আহা! আমার ইচ্ছে আমি তাকে জবাব দিয়েছি—এক মাসের বাড়তি মাইনেও দিয়েছি হে।"

"কিন্তু এভাবে আপনার খামখেয়ালের হুকুমেতে দুনিয়া চলছে না। কাজের যখন চাপ বাড়ছে তখন একটা মূল্যবান অঙ্গচ্ছেদ করা ঠিক হল না।"

"দুদিন সামলে চলো। আজই ইংরাজী কাগজ গুলোতে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দাও। বিজ্ঞাপনটা বেরুতে যা দেরী। আমার বিশ্বাস স্মিথের চেয়ে ঢের যোগ্য কাজের লোক পাওয়া যাবে।"

"দেখুন, যোগ্যতা বিচারের ভার আপনার নিজের ওপর না রেখে ওটা আমায় ছেড়ে দিন। মিস্ স্মিথের মত এমন মুখ বুজে কাজ করতে পারে তেমন মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি।"

মেজর চৌধুরীর চুরুটটা ঠোঁট থেকে নেমে হাতে আশ্রয় লাভ করল—তারপরই তিনি হো হো ক'রে দিলখোলা হাসির হর্রা তুললেন। অমরেশ অবাক হয়ে গেল। আবার কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেল সে।

চৌধুরী সাহেব অতি কষ্টে হাসি সামলাতে সামলাতে বললেন—"বটে বটে! খুব এফিসিয়েন্ট মেয়ে মিস্ স্মিথ—তাই না! অমরেশ, বিদ্যাবত্তায় তুমি আমার গুরু হ'তে পার—কিন্তু সাংসারিক দিক দিয়ে আমার মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, বুদ্ধিতে পাক ধরেছে হে!"

"তার মানে?"

"মানেটা আমার মুখ থেকে না শুনে নিজেই বুঝে ছাখো না।"

"দেখুন, ঘোরাটে আকাশ আর ঘোলাটে কথা বরদাস্ত করি না। স্পষ্ট কথা বলুন।"

"ইদানীং তোমার সঙ্গে মিস্ স্মিথের মেলামেশাটা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছিল কি না—তাই ওকে সরিয়ে দিলুম। সোজা কথাটা এবার বুঝতে অসুবিধে নেই ত।"

"মেজর চৌধুরী, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।"

"তা হ'লে ত খুশিই হতুম। কিন্তু নিজের চোখে ত' মিথ্যে দেখেছি মনে হয় না।"

"আপনি—আপনি কি দেখেছেন!"

"আমি যা দেখেছি তাতে তোমাদের দু'জনেরই চাকরী খেয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সে যাক, তুমি একটা বিজ্ঞাপন লিখে কাগজে কাগজে পাঠিয়ে দাও—মধ্যবয়স্কা মেয়ে অথবা অভিজ্ঞ পুরুষ হলেও কাজ চলবে, সেটা উল্লেখ করতে ভুলো না।"

"কিন্তু তার আগে আমার জানা দরকার কেন স্মিথকে বিনাদোষে বরখাস্ত করলেন।"

"ক্যামেরা হাতে থাকলে ফটো তুলে রাখতাম এবং তুমি তখন অস্বীকার করতে পারতে না অমরেশ। না, আমার সেজন্য আপত্তি নেই কিন্তু যেখানে কাজটা কর্তব্য, অফিস কাছারী, সেখানকার শো-টা বজায় রাখা ত উচিত? তোমাদের ইয়েটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়—তবে ওই যে বললাম, মানুষের Showটা বজায় রেখে, অপরের চোখ বাঁচিয়ে চলাই শোভন, নইলে খেলো হতে হয়। এটা যদি আমি না হয়ে অন্যের নজরে পড়ত তাহলে কি বিশ্রী ব্যাপার হ'তো বলো।"

"কিন্তু মেজর চৌধুরী আপনার এ কল্পনাগুলো এত Hypothetical যে এ নিয়ে তর্ক করা চলে না। তবু বলি যে, আপনি মিথ্যে মিথ্যে মিস্ স্মিথকে তাড়াচ্ছেন। Immediately ওকে ডেকে আনা উচিত।"

"না, তা সম্ভব নয়।"

"কেন? আপনি কাল যা দেখেছেন সে সর্বৈব ভুল মেজর চৌধুরী।"

এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল অমরেশ চাকরা করছে মেজর চৌধুরীর কাছে—কিন্তু ইতিপূর্বে তাকে একরকম নরম বিনত করে কথা বলতে কেউ শোনে নি। মেজর চৌধুরী বিস্মিত হলেন।

অমরেশ বললে, "তবে শুনুন, ওর কাছে ক্ষমা চাইছিলাম আমি যেক মুহূর্তটি আপনি লক্ষ্য করে আপনার মনোমত ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের ব্যবহারের।"

"ক্ষমা? কিসের জন্য ক্ষমা চাইছিলে? যাক গে, That is a matter between you two. আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই নে—কিন্তু তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা কইতেও চাইনে। যা করেছি বুঝেই করেছি।"

অমরেশ আরও কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল কিন্তু মেজর চৌধুরী উত্তেজনায় আবেগে অধীর—তিনি হাত নেড়ে অমরেশকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি আমার অধিকারের দাগ পেরিয়ে যাওয়া পছন্দ করি না। তেমনি আর কেউ আমার ব্যক্তিগত অধিকারকে ব্যাহত করতে এলেও বরদাস্ত করি নে। তুমি একটা বিজ্ঞাপন—"

পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল, মেজর চৌধুরী ব্যস্তভাবে চলে গেলেন—"Surely a call from Dr. Roy."

শূন্য ঘরে অমরেশ অসহায়ভাবে বসে রইল।

অমরেশ কালকে বিকেলের কথা ভাবতে লাগল। নিজের সঙ্গে তার বোঝাপড়ার সূত্রটা বিস্ময়ের আতিশয্যে অভিভূত হয়ে পড়ল। পড়ন্ত বেলার শেষ রক্তিম আভার সঙ্গে জড়িত একটি পরিবেশ অমরেশের মনকে আচ্ছন্ন করে দিল। সবেমাত্র কালকের কাহিনী, সেটা আজ কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে। সবে গতকাল যা ঘটেছে—

অমরেশের দু'খানা চিঠি এবং একটা ষ্টেটমেণ্ট কিটি শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিয়েছে—ওর টাইপ শেষ করা হলে অমরেশ একবার চোখ বুলিয়ে দেখে দিয়েই চলে যাবে। কিটি টাইপ করবার মেসিনে বসল। অমরেশ একবার পাশের ঘরে মেজর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। শ'খানেক টাকা তার দরকার। মেজর চৌধুরীকে সেকথা বলবার জন্য তাঁর কাছে অমরেশের যাওয়া।

অমরেশ দেখে চৌধুরী হুরের জিনিস দেখবার চশমাটা টেবল থেকে নিয়ে বললেন—"ও! অমরবাবু! তা হঠাৎ কি এ বিস্ময় হেরি নয়ন সম্মুখে! তুমি আমার ঘরে স্বয়ং হাজির!"

নিজে থেকে মেজর চৌধুরীর ঘরে অমরেশ এর আগে যায়নি নি—এই প্রথম। দু-একবার তিনি বলতে গিয়ে বেকুব হয়েছেন। অমরেশ জবাব দিয়েছে—"আপনার অফিসে চাকরী করি মেজর চৌধুরী—তা যদি কিছু বলতে হয় আপিসেই বলবেন। আপনার বৈঠকখানায় আর পাঁচজনের সামনে হুজুরে হাজির না-ই ক'রলেন।"

তাই অমরেশকে দেখে মেজর চৌধুরী যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়েছেন।

"একটা খুব জরুরী গরজে পড়ে কৃপা প্রার্থী স্যার!"

"আমার এত বড় ভাগ্য!"

"আজই আমার একশটি টাকার বড় দরকার, তাই—"

"আচ্ছা! কিন্তু অমরেশ, একটা অপ্রিয় সত্য, তোমায় বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমি তোমার কাছ থেকে এতদিন শুকনো ফরম্যাল আচরণই পেয়ে এসেছি—আজ হঠাৎ নিজের প্রয়োজনে তুমি আত্মীয়তা করতে এলে, আমার এতে সায় নেই, এর জন্য আমি দুঃখিত।"

মেজর চৌধুরী কথাটা কিছু মিথ্যে বলেন নি। অমরেশ বরাবরই একটা সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে চলছে—তার ধারণা এইসব বাঙ্গালী মনিবরা আত্মীয়তার ভাব দেখিয়ে কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায়ের ফিকির খোঁজে। মেজর চৌধুরীকে সে গোড়া থেকেই অপছন্দ করে। তার বিশ্বাস, যারা দেশের মানুষ আর মাটিকে অন্তরে অন্তরে অবজ্ঞা করে তারাই টাকার ঝোঁকা দিয়ে নেতা সেজে বসতে চায়। মেজর চৌধুরীর পয়সার অভাব নেই। মোটা মাইনের চাকরীর মেয়াদ ফুরোলেই তিনি রাতারাতি দেশকর্মী হওয়ার চৌরঙ্গীতে হাটবেন বলে মনস্থ করেছেন। সেই কারণেই অমরেশকে বহাল করেছেন আর কিটি স্মিথও সেই সুবাদেই ছিল অমরেশের স্টেনো।

যা কিছু বিদ্যা বুদ্ধির কাজ অমরেশকেই করতে হয়। পয়সা দিয়ে তিনি অমরেশের বুদ্ধি বিদ্যাকে ক্রয় করেছেন। অমরেশ এসম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতন—

বরং হুঁসিয়ার বললেই ভালো হয়। মেজর চৌধুরীর দম্ভ আছে, তবে দম্ভের চেয়ে বিচক্ষণতা তাঁর কম নয়। অমরেশের কর্মদক্ষতার জন্য অনেক ছোটখাট অপমান অম্লানভাবে হজম করে থাকেন।

তবে এমন সুবর্ণসুযোগ হাতে পেয়ে ছাড়তে পারেন তেমন নির্বোধ, অমায়িক মানুষ মেজর চৌধুরী নন্।

খোঁচাটা অমরেশের কাছে অপ্রত্যাশিত। সে উত্তপ্ত হয়ে উঠল, বললে—"আত্মীয়তা করা আমার স্বভাব নয়। ওতে ব্যক্তিসত্তা নষ্ট হয়। যাক্, যা বলছিলাম, আমার খুব দরকার, আর ত সাতদিন পরেই মাইনে দিতেন, যদি অর্দ্ধেক অগ্রিম দেন।"

"অর্থনৈতিক আদর্শ এরকম কাজকে বোকামী বলে, মানো তো? অগ্রিম দেওয়া তাকেই চলে, যে আমাকে মেনে চলে।"

অমরেশ শুষ্ককণ্ঠে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ঘরে এসে বিরসভাবে টেবিলের উপর পা তুলে বসে একখানা বই পড়তে লাগল। মনটা কিন্তু বই ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেছে কখন। শীর্ণা একটি মেয়ের তৈলহীন চূর্ণ চুলের উড়ন্ত শিহরণ অমরেশের মনকে বেদনাতুর করেছে। পৃথিবীর কাউকেই বিশেষ করে অমরেশ ভালোবাসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবেই জীবনকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের ছোট বোন তার টি, বি,। কি করবে অমরেশ! টাকা যেমন ক'রে হোক জোগাড় করতেই হবে। মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাতে মোটেই দেরি করা চলে না। অমরেশ টেবলে পা তুলে বইখানা সামনে রেখে ভাবছিল আকাশ-পাতাল।...বাড়ীর প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।

হঠাৎ কিটি স্মিথের কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠল সে। কিটি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললে "এক্সকিউজ মি—"

অমরেশ শান্ত গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল "হ্যাভ্ ইউ ফিনিশড্! Please read out.

কিটি বিনীত-নম্র ভঙ্গিতে বললে ইংরেজীতে, "হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলছিলাম অমরেশবাবু!"

অমরেশ বিস্মিত হয়ে কিটির মুখের দিকে তাকাল। কৃশ তন্ত, রুক্ষ পরুষ মুখ কিটির।

কিটি অনেকক্ষণ ধরে ভনিতা করল—"দেখুন মিঃ দত্ত, আমরা দু'জনে একজায়গায় এতদিন ধ'রে কাজ করছি যে, একজাতের মানুষ হ'লে আত্মীয়তা জন্মে যেত। আর আমাদের মাতৃভূমি বলতে ত ইণ্ডিয়া, আপনারও তাই—তবু আমরা কেন যে একসঙ্গে থেকেও আলাদা হয়ে থাকি সেটা আশ্চর্য লাগে আমার কাছে।"

অমরেশ কিছুতেই বুঝতে পারে না কিটি স্মিথের এ কথাগুলো হঠাৎ আজকেই বা কেন বলবার দরকার হ'ল। কিন্তু তাকে স্বীকার করতেই হ'ল যে কিটি যা বলছে তা মিথ্যে নয়। সে দু'এক কথায় সায় দিয়ে নিজের কোটরস্থ মনকে যতটা সম্ভব নিষ্ক্রিয় রাখতে চায়—আজ এসব কোনো কিছুতেই অমরেশ মন দিতে পারছে না। অন্যদিন হ'লে এর ওপর একটা বিশ্লেষণমূলক বক্তৃতা দিত সে অবশ্যই। কিন্তু—। তবু কিটি স্মিথ ক্ষান্ত হ'ল না। ও বললে—"আমি বলছি মিঃ দত্ত, আপনার মত মানুষও এগুলো যদি এড়িয়ে যায় তাহলে এই পার্থক্যবোধ কোনদিনই ঘুচবে বলে আশা হয় না।"

অমরেশ বললে—"আমার পক্ষে কি করা সম্ভব! আপনি কি এর ওপর কোনো প্রবন্ধ লিখে কাগজে আন্দোলন চালাতে বলেন মিস্ স্মিথ।"

"সে ত পরের কথা। আপাততঃ ব্যক্তিগত জীবনে একটু মিলমিশ শুরু করার কথা বলছি।"

"তা করা যেতে পারে।" অমরেশের কণ্ঠে কিছুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ পায় না। সে কেমন নির্জীব নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো বললে।

কিন্তু কিটি স্মিথ অত্যন্ত জোর দিয়ে কথা বলছে, ওর সেই নিষ্প্রাণ করুণ চেহারা একেবারে বদলে গেছে। কিটি স্মিথের চেহারা প্রাণোচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল তাম্রাভ দেখাচ্ছে। কিটি বললে—"আমাকে আপনি একটা সুযোগ দিন। আজ থেকেই তা'হলে আমরা শুরু করতে পারি।"

অমরেশ বিরক্তি বোধ করল। মেয়েটা ঠিক কি চায় সে বুঝতে পারছে না—অত গরজও নেই তার। চুপ করে রইল সে।

কিটি বললে, "টাকাটা আপনি আমার কাছে ধার নিন।"

"টাকা? আপনাকে কে বললে যে আমার টাকার দরকার?"

"দেখুন মিঃ দত্ত, আমার কাছে লুকোবার মিথ্যে চেষ্টা করবেন না। এই একটু আগে মেজর চৌধুরীর সঙ্গে আপনার যে কথাবার্তা হয়েছে পার্টিশনের আড়াল ডিঙিয়ে সবই আমার কানে পৌঁচেছে। যদিও আমার সেসব কথা না শোনাই ভালো ছিল, কিন্তু মানুষ মানুষই। আমি শুনে ফেলেছি। কৌতূহল হ'ল মেয়েদের স্বভাব।"

"শুনে ফেলেছেন মানে? আপনি বুঝলেন কি করে। Then you Know Bengali। মানে আপনি বাংলা জানেন?

"অভাবের ভাষা, অর্থের প্রয়োজন এসব বর্ণমালার ইংরেজী বাংলা বলে কিছু নেই। সব ভাষাই এখানে এসে এক হ'য়ে গেছে। তবে আজ বলেই ফেলি হ্যাঁ, বাংলা জানি।"

"ইস্!", বলে অমরেশ অসহায়ভাবে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা বার-বার কামড়াতে লাগলো। যখন কোন পথ খুঁজে না পায় তখনই নিজের আঙুল কামড়ায় সে। এই কু-অভ্যাসের জন্যে স্কুলে তাকে বহুবার বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে হ'ত।

কিটি স্মিথ হাসছিল—ওর চোখমুখে একটা কৌতুকের জোয়ার।

অমরেশ আবার বলল—"আপনি বাংলা জানেন? আপনি—! মানে এতদিন আমার এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের বাজে মন্তব্যগুলো সব সহ্য করেছেন বুঝে শুনে!"

কিটি আদ্র কণ্ঠে জবাব দিল—"যার রূপ নেই তার সহনশীলতা না থাকলে সে বাঁচবে কেন মিঃ দত্ত? ছেলেবেলা থেকে আমি ওকথা প্রতিনিয়ত শুনে আসছি। আপনাদের দোষ কি—!"

অমরেশ মুখ তুলতে পারছে না লজ্জায়। ওর মনে পড়ে গেল মেমসাহেব স্টেনোর খবর পেয়ে তার উৎসাহী বন্ধুদের আনাগোনার কথা।

কিন্তু তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কিটিকে দেখে নাক সিঁটকে যা-তা বলেছে। জগদীশ একদিন বলেছিল—"ক্যাওড়া গাছের নিমাই পণ্ডিত যে রে, একেবারে অযাত্রা। মেয়ে-পুরুষ কোন জাতেই ফেলা যায় না যে!"

সময়ে সময়ে অমরেশ নিজেও তাদের আলোচনায় যোগ দিয়েছে। কী-ই না বলেছে সবাই মিলে তারা! কিটি স্মিথ বাংলা বোঝে না এ ধারণাই উদ্বুদ্ধ করেছে। পরন্তু যখন জগদীশ বললে, "পেঁচিকে তাড়াচ্ছিস কবে?"

তখন অমরেশ হেসে বলেছিল, "ওকে আমি ছাড়লে কে আর নেবে?"…

"কিন্তু মিস্ স্মিথ, আমি কি বলে আপনার কাছে মাপ চাইব।" বলতে বলতে অমরেশ আবেগভরে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল—"আমাদের সকলকে আপনি ক্ষমা করতে পারবেন মিস্ স্মিথ। পারবেন না?" এবং দু'হাত দিয়ে কিটির ডান হাত খানা চেপে ধ'রে সে বললে—"যদি 'না' বলেন তাহলে আপনার ওপর রাগ করতে পারি না। কিন্তু আপনার হাত ধরে মাপ চাইছি। আমাদের দেশে বয়সে কনিষ্ঠের কাছে হাত ধ'রে মাপ চাওয়া, আর বয়সে বড়দের কাছে পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাওয়া এক—বুঝেছেন!"

কিটির চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল। ও বললে—"আপনি যদি আজকে এই টাকাটা আমার কাছ থেকে নিতে পারেন তাহলে বুঝব যে আপনি আমাকে ছোট বোন বলে গ্রহণ করেছেন। বলুন, নেবেন।"

অমরেশ কোন জবাব দেবার আগেই স্প্রিংয়ের দরজাটা দুলে উঠল এবং মেজর চৌধুরী ভেতরে ঢুকেই স্বগতভাবে "ও!" বলে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, অমরেশ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে—"কিছু বলছিলেন কি মেজর চৌধুরী?"

কিটির শীর্ণ হাতখানা তখন অমরেশের বলিষ্ঠ মুঠোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ঘামছিল।

"ইয়ে, যাওয়ার সময় একবার দেখা করে যেয়ো।" কথাগুলো মেজর চৌধুরী ঘরের বাইরে থেকেই বললেন।

তার পরের ঘটনা সামান্যই। কিটি তার বিবর্ণ ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একখানা একশ' টাকার নোট বার করে অমরেশকে দিয়ে বলল—"আপনার সুবিধা মত দেবেন। এটা আমার মাইনের টাকা নয়, ওই ড্যালহৌসীর আপিসের একটি বোনাস পেয়েছি আজই।"

"কিন্তু একটা কথা মিস্ স্মিথ—"

"আজ হতে আপনি আমার ক্রিশ্চান নাম ধরে ডাকবেন—কিটি বলবেন।"

"আচ্ছা কিটি, বেশ। কিন্তু তোমারও টাকার দরকার। নিজের অসুবিধা করে কেন দিচ্ছ!"

"অসুবিধে কিছু না, আর দরকারের কথা বলছেন, পৃথিবীতে কার না দরকার? আমি ত জানতাম না যে বোনাস পাওয়া যাবে আজ হঠাৎ!"...

কালকের সন্ধ্যার সঙ্গে আজকের সন্ধ্যার অনেক তফাৎ। ঠিক এই ঘরে, এই সময়ে কাল কিটি স্মিথের হাত ধরে মাপ চেয়েছে অমরেশ, আর আজ সেই সময়ে সেই হাত দিয়েই তাকে লিখতে হবে নতুন ষ্টেনোগ্রাফারের জন্য বিজ্ঞাপন।

এ চাকরী তার এখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

পাশের ঘরে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ এল কানে। বাড়িখানা আশ্চর্য রকম স্তব্ধ, অমরেশের মনের মতই যেন।

মেজর চৌধুরীর স্লিপারের শীর্ণ শব্দ কাছিয়ে আসছে।

অমরেশ লিখছে বিজ্ঞাপন নতুন লোকের জন্য। ওর মনের সামনে এসে কিটি স্মিথ যেন বলছে—"কেন যে আমরা আলাদা হয়ে থাকি সেটা খুবই আশ্চর্য লাগে আমার কাছে।...যার রূপ নেই তার সহনশীলতা না থাকলে সে বাঁচবে কি করে?...আমাকে ছোট বোন বলে গ্রহণ করেছেন।" ঠিক সেই সময়ে মেজর চৌধুরী শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"বিজ্ঞাপনটা লেখা হল? ওটা দাও আমাকে, মিস্ত্রীচাঁদকে দিয়ে এখুনি কাগজে পাঠিয়ে দিই; সত্যি তোমারও ত' কম কষ্ট নয়! টাইপ করা, আর চিন্তা করা দুটো একাই করতে হবে ত'!"

অমরেশ চুপ করে থাকে, জবাব দিতে আদৌ ইচ্ছে করে না।

চৌধুরী বললেন—"হ্যাঁ ভালো কথা অমরেশ, তুমি যে একশ' টাকা চেয়েছিলে কাল, সেটা আজ নিয়ে যেয়ো। ভাখো আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক বড়—হয়ত পিতৃতুল্যই হবো, আজকালকার ছেলেছোকরা তোমরা মানো না। পুরো মাইনেটাই নিয়ো হে।"

"Thanks. আমি আপনার চাকরী করি বটে, তবে মনে মনে আপনাকে ঘৃণাও করি।"

"Well! Well, Well!"

"কাল কিটি স্মিথ আমাকে একশ' টাকা ধার দিয়েছে।"

"ধা—র! তা তোমাকে ত দিতেই পারে।"

"আপনার অন্তরটা টাকার ভারে চাপা পড়ে গেছে। যাদের অন্তর আছে তাদের টাকা নেই বলে তাচ্ছিল্য করলে ভুলই করবেন মেজর চৌধুরী। কিটির ব্যবহারে কাল আমি অভিভূত হয়ে গেছি।"

"ছাখো, আমি তোমার মত অবিবেচক নই। তোমাকে যদি স্নেহ না-ই করতাম তাহলে কবেই তাড়িয়ে দিতে পারতাম। ঘৃণা যে আমাকে করো সেটা নতুন খবর নয়, কিন্তু মুখের ওপর ওরকম বললে বড্ড বিশ্রী দেখায়। I request you, আর কখনো বলো না। ইয়ে টাকাটা নিয়ে যেয়ো—।"

"আবার বলছি আপনাকে ঘৃণা করি। তবে বুদ্ধি আপনার অল্প নয় বুঝলাম।"

"কিসে বুঝলে—।"

"আমাকে আপনি এখনও টাকা দিয়ে কিনে রাখতে চাচ্ছেন।"

"বেশ ত, তুমি নিজে বিক্রী হয়ো না—"

আরও অনেক কথান্তরের পর কি মনে করে অমরেশ বললে—"আচ্ছা, টাকাটা দেবেন"—

সঙ্গে সঙ্গেই মেজর চৌধুরী পকেট থেকে একখানা লেখা চেক বার ক'রে দিলেন।

অমরেশ রসিদ সই ক'রে চেকটা ঘড়ির পকেটে রেখে দিল।

পরদিন বিকেলে অমরেশ আপিসে এলো না। চলে গেল সে একেবারে বিপরীত দিকে।—রিপন স্ট্রীটের হলদে দাগধরা একখানা প্রাচীন বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে নম্বর মিলিয়ে নিল। আশপাশে চেয়ে তার গা-টা কি রকম হয়ে উঠল। এ পাড়ার হালচাল খুব মনঃপূত হবার মত নয়। এ বাড়ির দোতলার সিঁড়ির সামনের আলোটা কেমন ঘোলাটে—বহুদিনের পুরানো বাল্‌ব টা জ্বলে জ্বলে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

কলিং বেল নেই। কড়া নাড়ছেই একটি দোহারা চেহারার বৃদ্ধ সাহেব দরজা খুলে অমরেশের সামনে দাঁড়াল। নেহাতই অপ্রসন্ন দৃষ্টি তার। শুষ্ক কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"এখানে কি চাই? No fancy girl here!"

অমরেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল—"আচ্ছা, এখানে কি কিটি স্মিথ ব'লে কোনো মেয়ে থাকে?"

"কেন, কি দরকার তাকে?"

"আপনি তার কেউ হন কি?" অমরেশ ভদ্রলোকের কথার ঢঙে অনুমান ক'রে নেয় ইনি কিটির বাবা। আর চেহারাতেও মেয়ের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে।

"যদি তা-ই হয় তাতেই বা আপনার কি?"

অমরেশ একটু হেসে বলল,—"কিটি কি বাড়ী ফিরেছে?"

বৃদ্ধের পিছন থেকে স-কলরবে কিটি এগিয়ে এসে দাঁড়াল, "আসুন, আসুন দাদা!" ওর বাবার দিকে তাকিয়ে বললে—"তোমাকে যে মিঃ দত্তর কথা বলেছিলাম। ইনি সেই দত্ত। আশ্চর্য মানুষ! আমার ধর্ম-ভাই জানো বাবা!"

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,—"ও, তাই নাকি! আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব আনন্দিত হলাম।"

কিটি রীতিমত প্রতিবাদ করল, "ছাখো বাবা, তুমি বড্ড কেমন যেন হচ্ছ দিন-দিন। শুনছ উনি আমার ধর্মভাই—ওঁর সঙ্গে অমন আড়ষ্ট হয়ে কথা বলো না। ছিঃ"—

"আর মা বুড়ো হয়েছি এখন! বাদ দাও আমার কথা!" একটু ম্লান হেসে কিটির বাবা অমরেশকে বললে—"আসুন মিঃ দত্ত, বসুন এখানে। কিটি কালই আপনার কথা খুব বলছিল—সারাদিন বাড়ী থেকে বেরোয় নি। বেরিয়েই বা করবে কি, মিথ্যে মিথ্যে গাড়িভাড়ার খরচ সার। চাকরি ত' আর পথে গড়াগড়ি যাচ্ছে না। তবু ঘরে বসে থাকলেই বা কে জুটিয়ে দিচ্ছে—বলুন!"

বাপের কথায় আমল না দিয়ে দু'একটা আপ্যায়নসূচক কথার পরই কিটি স্মিথ বললে—"আপনাকে কিন্তু আজ রাত্রে এখানে খেয়ে যেতে হবে, দাদা।"

অমরেশ হেসে জবাব দিল—"সে কি করে হয়—আমি এখনো আপিসেই যাই নি।"

"ও তাই নাকি। তাহলে একটু বসুন, চা খাওয়া যাক এক সঙ্গে।" ব'লে কিটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমরেশ চারিদিকে চেয়ে দেখল। এটিই বসবার এবং শোবার ঘর। তিনখানা খাট পাতা রয়েছে। আয়তনে ঘরটি বড়—আসবাবও নিতান্ত অল্প নয়। তবে সব কিছুর মধ্যেই সেকেলে-সেকেলে ছাপ। দারিদ্র্য মাখানো সর্বত্র।

কিটি চোখের আড়াল হ'তেই বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসে বললে—"আপনাকে দু'একটা কথা বলব মিঃ ডাট্।"

অমরেশ বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দেখল ভুরুর চুলগুলো আশ্চর্য রকম সাদা এবং বড় বড়। সে বললে—"বলুন।"

"আপনি ত হচ্ছেন কিটির ভাই। তার মানে ধরুন আমার ছেলের মতই হচ্ছেন ত। তাহলে আর বলতে বাধা কি।"

"না, না, আপনার সংকোচ করবার কিছু নেই—স্বচ্ছন্দে বলুন।"

"হ্যাঁ, বলছি। দেখবেন যেন মেয়েটার কানে আবার এসব কথা না ওঠে—তাহলে আমার কপালে দুঃখু আছে। রোজগেরে মেয়ে কি না—তার মান রেখে চলতে চলতেই যীশুর ডাক পড়বে।"

জামার মধ্যে হাপরের মত বৃদ্ধের বুকের পাঁজরাগুলো হঠাৎ ফেঁপে উঠে চুপসে গেল দীর্ঘশ্বাসে। তারপর ছোট্ট একটা কৌটো বের করে, এক টিপ নস্যি নিয়ে বৃদ্ধ বললে—"মাপ করবেন—বুড়ো মানুষ, সবই ছেড়ে দিতে হয়েছে, এই নস্যির ওপর খেসারত টেনে বেঁচে আছি। But this is no life Mr. Dutt।"

অমরেশ চুপ করে বসে আছে। কিটি ফিরে এলে, ওর হাতে টাকাটা

দিয়ে চলে যেতে পারলে সে বাঁচে। বুড়োর ঘরখানার মধ্যে কেমন জমাট বাঁধা বিষণ্ণতা স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এখন অমরেশ বেশ বুঝতে পারছে—কিটি স্মিথ মূক বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি না হয়ে পারে না। এই পরিবেশ যে কোন সুস্থ মানুষকে এক মুহূর্তে বোবা করে দিতে পারে।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বৃদ্ধ বললে—"মেয়েটাকে নিয়ে ত ভারি মুস্কিলে পড়েছি মশাই। আমি বলি কি, চাকরী করতে গেলে মনিবের কাছে বকুনি সবাই খায়—না কি, বলুন না মিঃ ডাট্। তা বলে ইস্তফা দিয়ে চলে আসতে আছে?"

অমরেশের তরফ থেকে জবাব না পেয়েও বৃদ্ধ দমল না—"তা ফের গিয়ে মেজর চৌধুরীর কাছে মাপ চাইলে কেমন হয়। আমি বলছি কি, বেশ ত' তোমার যদি অত লজ্জা, আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে—তা নয়। একবার ভাব্‌ছে না যে, চাকরী গেলে কি করে সংসার চলবে? বুড়ো-বুড়িকে শুকিয়ে মারবার মতলব করছে বেটী! ওদিকের বড় অপিসের টেম্পরারী চাকরীটাও ত ঘুচে গেছে!—আচ্ছা দত্ত, তুমি হাত দেখতে পারো? ইণ্ডিয়ানরা ত খুব ফরচুন-টেলর হয়। দ্যাখো দেখি আমাদের হাতগুলো—"

বৃদ্ধ হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠল। ডাকলে মিসেস স্মিথকে—কিটিকেও ডাকল—কিটির জবাব এল—"আমি যাচ্ছি চা নিয়ে।" আর মিসেস স্মিথ এতক্ষণ বাইরের বারান্দাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন যেমন, তেমনই রইলেন। একবার শুধু ভ্রূকুটি করে ফিরে দেখলেন মাত্র।

অমরেশ বললে—"আমি ত হাত দেখতে জানি না।"

"যাঃ, তাও কি হয় নাকি? বলো যে বিনা পয়সায় দেখতে রাজী নও। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ত আমরা কত গরীব। দ্যাখো দ্যাখো।"

মিসেস স্মিথ আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে বৃদ্ধকে বাধা দিয়ে অমরেশকে বললে—"ওর কথা শুনবেন না বাবু—আমার কর্তার মাথায় একটু ছিট। তাছাড়া হঠাৎ কিটির 'দুটো' চাকরীই চলে যাওয়াতে মুষড়ে পড়েছে। বুড়ো মানুষ—"

"দুটো চাকরীই গিয়েছে?" অমরেশ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়।

"হাঁ, একটা ত টেম্পরারী ছিল। পরশু দিন তারা পনেরো দিনের

মাইনে চুকিয়ে জবাব দিয়ে দিয়েছে। আর মেজর চৌধুরীও এক মাসের মাইনে দিয়েছেন। কী যে হলো। বিপদের ওপর বিপদ ভাখো, বড় অফিসের মাইনে পেয়ে মেয়ে আবার কাকে ধার দিয়ে এলেন। মেয়েটা বড্ড বোকা। আজ পর্যন্ত কত লোকে যে ওর কত টাকা মেরে দিল। তবু এখনও— মানুষকে ও বিশ্বাস করে।"

ক্ষিটি স্মিথ চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল—"তোমাদের কি আর কোন কথা নেই মুখে, মা? আমার ভাবনা আমাকে ভাবতে দাও—"

অমরেশ উঠে ট্রে-টা ধরতে গেল—কিটি হেসে উঠল—"থাক থাক। ধন্যবাদ।"

অমরেশ বেশিক্ষণ বসল না। গরম চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে তার জিভ পুড়ে গেল। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বাইরে এসে কিটির হাতে টাকাটা দিয়ে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। পিছু পিছু কিটিও রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বিদায়ের সময় অমরেশ বলল—"কাল থেকে আপিসে যেতে বলেছেন চৌধুরী।"

খবরের কাগজের আপিসে এসেই অমরেশ মেজর চৌধুরীকে টেলিফোন করল।

চৌধুরী সাহেব অনুযোগ করলেন—"কি হল হে। অসুখ বিসুখ করেছে মনে করে আমি আবার মিশ্রীচাঁদকে তোমাদের বাসায় পাঠালুম। শুনি, আপিসের নাম করে বেরিয়ে এসেছ। আজ অনেকগুলো জরুরী কাজ ছিল।"

অমরেশ বলল—"কাল সকালে গিয়ে সেরে দিয়ে আসব নিশ্চয়। কিন্তু তার আগে একটা কথা ছিল।"

"কি কথা?"

"কথাটি ক্ষিটি স্মিথের সম্বন্ধে।"

"তাহলে আর শুনিয়ো না। আমি—"

"না আপনাকে শুনতেই হবে। শুনছেন?"

"ফোন ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে।"

"না না—Once আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করুন। মানে, আজ

আমি আপিসে না গিয়ে কিটিদের বাড়ী গিয়েছিলাম। কালকের ধারের টাকাটা ফেরৎ দিতে গিয়ে দেখে এলাম ওদের দুরবস্থা।"

"সু-অবস্থা কার আছে বলো?"

"আমি ওকে বলে এসেছি কাল থেকে আপনার আপিসেই বেরুতে। এর জন্য যদি কিছু দুর্ভোগ ভুগতে হয়, আপনি আমার ওপর চাপিয়ে দিন।"

"না, না' সে হতেই পারে না। আমি যা করি একবারই স্থির করি।"

"কেন হবে না শুনি?"

"তোমার কাছে আমি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই।"

"আমি যে বলে এলাম আপনার নাম নিয়ে।"

"তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এখনি খবর পাঠিয়ে বারণ করছি।"

"কিন্তু আপনি ভুল করছেন মেজর চৌধুরী! শুনুন—হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—"

অপরপ্রান্তে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। আর কোনো সাড়া নেই। অমরেশের টেবলের পাশে খবরের কাগজের টেলিপ্রিন্টারে খবর ছাপা হচ্ছে খট—খট—খট—সর্র্—খট!

প্রেস থেকে বেয়ারা এসে দাঁড়ালো—কপি চাই।

অমরেশ ঘাড় গুঁজে কপি লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।...কোরিয়ার যুদ্ধের ওপর সারগর্ভ গবেষণা চাই—পণ্ডিত নেহরুর অবিমৃষ্যকারিতা প্রমাণ করবার দায়িত্বও অমরেশের ঘাড়ে ন্যস্ত।...এখন কি আর তুচ্ছ একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারের কথা ভাববার সময়? পৃথিবীটা অনেক বড়—বড় কি অনেক? ছকের বাইরে পৃথিবী আছে কি? নিজের গণ্ডী ছাড়িয়ে চলতে পেরেছে কোনো মানুষ! অমরেশ দত্ত নিরুপায়। এখন তাকে অবশ্যলিখিতব্য দুটি সম্পাদকীয় সৃষ্টি করতে হবে। সে পারবে কি করে আর কারও মুখ চেয়ে চলতে। নিজের মনের এই সব আত্মজিজ্ঞাসার পিঠে চাবুক মেরে সে লিখতে শুরু করল...শান্তি। সমন্বয়। মহামানবিক দৃষ্টি ভঙ্গিকে তীক্ষ্ণ প্রোজ্জ্বল দেখাতেই হবে, নইলে কাগজের আফিসের চাকরী বজায় থাকবে না। বড় কথা বলতে হবে—কথাই ত বড় হয়ে বেঁচে থাকবে।

বিন্দু বারিধি

মরণ পণ্ডিত মতলব ছাড়া এক-পাও চলে না। একথা সবাই জানে। তবু তার বাগ্‌বিন্যাসের জন্য তাকে পছন্দ করে সকলেই। তার সদাহাস্য আলাপ সত্যিই বড় গুণ।

কিন্তু মরণ পণ্ডিতের মুখের হাসি শুকিয়ে গেছে। পর পর তিনদিন কারবারে মন্দা চলছে। সকাল থেকে পাঁচখানা গাড়িতে হাঁকা-হাঁকি ক'রে মাত্র সাতটা মাজন বিক্রী হয়েছে। অন্যান্য সময়ে অন্ততঃ গোটা তিনেক ভীমভবানী পিল-এর শিশি কাট্‌তি হয়ে যায়। মরণ পণ্ডিতের এই ভীমভবানীই সংসার-যাত্রা নির্বাহ করার অস্ত্র। মাজনের ক' পয়সাই বা দাম, আর কীই বা লাভ তা থেকে। মরণ বিমর্ষভাবে একটা ইন্টার-ক্লাসের কামরাতে উঠ্‌ল।

আচ্ছা জ্বালাতন—এ গাড়িতেও সেই পাইয়ে ছোক্‌রা উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। নাঃ—কিন্তু ইতিমধ্যে গাড়ি প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে। এখন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনা ছাড়া কোন উপায় নেই। সময়টা স্রেফ নষ্ট। একটু আগে ছোকরাকে দেখতে পেলে মরণ অন্য কামরায় লেক্‌চার দিতে পারত।

গান বেশ জমে উঠেছে। রামপ্রসাদী সুর—আর, ছোকরার গলার জোর আছে। ওইটুকু কলজের হাওয়া ধরে অনেক। খুব চড়াতে তুলেছে ত বয়স খুব বেশি হ'লে চোদ্দ—কিন্তু কি দম রে বাবা, মরণ নিজেই যেন হাঁপিয়ে ওঠে ছোকরার কাণ্ড দেখে। অনায়াসে সুর নিয়ে খেলা করছে সে—। টিনের হ্যাট্‌কেশটা বাঙ্কের ওপর রেখে মরণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসল—বিক্রীবাটার আশ ছেড়ে দিয়েছে সে। এই জমাট গানের পর যদি সে—"দেখুন ভদ্রমহোদয়গণ আপনাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের রাত্রে ভালো হজম হয় না...' ব'লে বক্তৃতা শুরু করে তাহলে যাত্রীদের মধ্যে একটা প্রবল অসন্তোষ দেখ দেবে। কেউ কেউ ধমক দিতেও পারে। অতএব মন দিয়ে মরণ গান শুনছে

একটা গান শেষ হতেই স্যুটপরা একজন তরুণ বলে উঠলো—"বাঃ, তোমার গলাটি বড় দরাজ ত। গাও আর একখানা—"

গাইয়ে ছোক্‌রা বললে—"আ-আ-আ-প্‌-নি ত-ব-ল-ল্‌-লেন বাবু! আবার অনেকে আ-আ-ছে-এ-ন্‌ চ-ও-ও-টে যান্‌"!

আপন মনেই মরণ বললে—"ব্যাটা গান গেয়ে ভিক্ষে করিস—আবার তেজ আছে! কানের কাছে প্রাণ বিটকেলে চিল্লাচিল্লি করলে মানুষ চটবে না ত কি!"

স্যুটপরা তরুণটি তার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বললে—"কি হল মিস্‌ চৌধুরী, আপনি অমন উচ্ছে-খাওয়া মুখ ক'রে বসে কেন? গান ভালো লাগছে না!"

—"সত্যি কথা, কি রকম বিশ্রী গান—শুনলেই মন খারাপ হয়ে যায়। ও আবার কি—'কে তুমি যাচ্ছ বলো কাঁধে চড়ে শ্মশান ঘাটে'...থাক্তি একটু হলিডে মুডে, আপনি আবার ফরমাস দিচ্ছেন!" মেয়েটি জবাব দিল।

গাইয়ে ছোকরাকে ইশারায় কাছে ডেকে তরুণটি বললে, "আচ্ছা ভাই, মডার্ণ গান কিছু জানা নেই তোমার?"

—"আজ্ঞে?" ছেঁড়া গেঞ্জীটার দৈন্য সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়ে গাইয়ে ছেলেটি ছেঁড়া জায়গাতে বাঁ হাত চাপা দিতে দিতে প্রশ্ন করল "কি বলছেন?"

এবারে তরুণীটি একটু উৎসাহিতভাবে বললে—"আধুনিক গান কিছু—"

—"আজ্ঞে আধুনিক গান জানিনে, বায়স্কোপের গান দু'একটা শিখেছিলাম। সে আর আপনাদের কাছে গাইব না। ভালো লাগে না!" ছেলেটি বেজায় তোৎলা। এই ক'টি কথা বলতে তার অনেকখানি সময় লাগল। আর, কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে, মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে তার।

তরুণটি বললে—"আচ্ছা তোমার ইচ্ছেমত গাও।" মেয়েটির দিকে একটু মিনতিমাখা দৃষ্টিপাত করে সে বললে—"দেখুন মিস চৌধুরী, কলকাতায় রেডিও আর সিনেমাতে মডার্ণ গানের উৎপাতে কান ঝালাপালা হয়ে থাকে। আজ এই দু'ধারে ধানের ক্ষেত আর গাছপালা, গাড়ির দোলায়

সঙ্গে এমন মিঠে রামপ্রসাদীই ত সৌভাগ্যের সূচনা করছে। আমায় মাপ করুন—কলকাতায় গিয়ে চাই কি আমিই আপনাকে মডার্ণ গান গেয়ে শোনাবো—তখন সইতে পারবেন না।"

ওদিকে গায়কটি আবার শুরু করে দিয়েছে। রামপ্রসাদী নয়, রবীন্দ্র-নাথের গান—"আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না—ভালোবাসায় ভোলাবো"।

গাড়ি থামল পরের স্টেশনে। গায়ক হাতের পয়সাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে তরুণটিকে নমস্কার ক'রে নেমে গেল—"যাই বাবু।"

—"তোমার গলাটা খুব সুন্দর হে, তা এমন পথে পথে ঘুরে বেড়াও কেন—কলকাতায় রেডিও, সিনেমাতে তোমায় পেলে লুফে নেবে।"

—"আজ্ঞে—অমন কথা অনেক বাবুই ত বলেন মুখে—তা শুনে আর লাভ কি। যাই বাবু, এ ইস্টিশনে না নামলে ফিরতি গাড়ি পাবো না। এই যে আপনি যত্ন ক'রে গান শুনলেন এতেই পরমাত্মা খুশি।"

ওভার ব্রীজ দিয়ে অপরদিকের প্লাটফর্মে আসবার সময় মরণ পণ্ডিত গায়কটিকে ডেকে বললে—"হ্যাঁ বাবা, তোমার নামটি কি বাবা।"

—"আমার নাম শ্রীরামপ্রসাদ সেন—নিবাস বৈদ্যবাটী, পিতার নাম—"

—"থাক, থাক। তুমি স্বনামধন্য হও বাবা। পিতৃ-পুরুষকে আর টানাটানি করা কেন?"

দূরে সিগন্যাল ডাউন হ'ল। এদিকের গাড়ীখানা ছেড়ে গেল—তার হিস্‌-হিস্‌ গর্জনের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল, কোন নারকেল আর কলাবাগান পেরিয়ে।

মরণ পণ্ডিত এক টিপ নস্য নিয়ে একটু হাসলো—"বাঃ একেবারে শ্রীরামপ্রসাদ সেন! বাঃ-বাঃ! নিবাস বৈদ্যবাটী। তা বাবা রামপ্রসাদ তোমার এই গানের ব্যবসায় দিন গড়ে কত আয়?"

—"আজ্ঞে সামান্যই। পাঁচজনের দয়ার ওপর কি আর ভরসা করা যায়?"

—"তবু?" প্রশ্নের সময় মরণের ভ্রূ কুঞ্চিত হল—"আমার ত মনে হয় বাপু—মানে যা দেখলাম তাতে বেশ ভালোই—এঁ্যা।"

—"আজ্ঞে আজ পড়তা পড়ে গেল, তাই—সওয়া দু'টাকা হয়েছে। তবে কি জানেন, ওই ছোকরা বাবু একাই ত আট আনা দিলেন কিনা।"

—হ্যাঃ। আদিখ্যেতা। পয়সা দিলেই কি আর সমঝদার হয়। ওসব আমার অনেক দেখা আছে। ওসব হচ্ছে কলকাতার ফোতো। ওরা গানের কি বোঝে? তবে হ্যাঁ, গান তুমি মন্দ গাও না। কিন্তু ভাবছিলাম কি জানো—বাবা রামপ্রসাদ?"

—"আজ্ঞে, আজ্ঞা করুন।"

—"নাঃ, সেকথা অমন হট্ ক'রে বলার নয়। চলো, আমাদের গাড়ি এসে গ্যালো। ওই আমারও বাড়ি শ্যাওড়াফুলি। গাড়িতে কথা হবে।"

রামপ্রসাদকে দু'পয়সার এক প্যাকেট চানাচুর কিনে দিয়ে মরণ পণ্ডিত বলল—"আহা তোমার বড্ড খাটনী হয়েছে। খাও—"

পথের পরিচয়ে যে কোনো মানুষ এতখানি দরদী হয়ে উঠতে পারে এ-ধারণা রামপ্রসাদের জীবনে এই প্রথম। সে অবাক হয়ে শীর্ণ চানাচুরের প্যাকেটটা দেখতে লাগল। প্যাকেটের গায়ে নামাবলীর মত আষ্টেপৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন, কপিং কালিতে রবার ষ্ট্যাম্পের ছাপ।

মরণ পণ্ডিত তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল—"আহা তাতে কি হয়েছে খাও, লজ্জা কী!"

এ কথায় রামপ্রসাদ লজ্জিত হ'ল একটু, পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লজ্জা সংকোচ কিছুই তার মনে উদয় হয়নি।

একখানি থার্ডক্লাস কামরা। কলকাতাগামী ট্রেনের থার্ডক্লাস খুব ফাঁকা হবার কথা নয়। বেঞ্চে, বাঙ্কে, দাঁড়িয়ে, মালের ওপর বসে এবং ফুটবোর্ড ঝুলতে ঝুলতে যাত্রী চলেছে। এর ওপর ব্যাপারীদের তরকারীর ঝোড়া আর বস্তায় দরজার সামনেটা জুড়ে রয়েছে। রামপ্রসাদকে পিছনে ফেলে রেখে মরণ পণ্ডিত টপ্ ক'রে একটা গাড়ীতে উঠে পড়ল। তারপর রামপ্রসাদকে হাতের ইশারায় উপরে উঠতে ইঙ্গিত করতে করতে বক্তৃতা শুরু করল—"আপনাদের

কাছে একটা নিবেদন। আপনারা খুব ছোটখাট অবস্থায় ব্যাধিকে অবহেলা ক'রে বড় অসুখ বাধিয়ে বসেন। আমার সামনে যে সকল ভাই রয়েছেন, তাঁদের কাছে এই অনুরোধ কথায় কথায় ওষুধ খাওয়ার অভ্যাসটা বদলান আপনারা। বিজ্ঞান আজ কি বলছে জানেন? বলছে নেচার কিওর। মানে, আপনা-আপনি অসুখ সারে। তার মানে কি? শরীর ত সব সময়েই রোগকে তাড়াবার জন্য যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধই ত জীবের প্রাণ। কিন্তু কি জানেন! মানে যে, শরীর যাতে ক'রে রোগের সঙ্গে লড়াই করতে পারে তার জন্য আমাদের কিছু কিছু গাছ-গাছড়া থেকে প্রস্তুত harmless মানে নির্বিষ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। মানে এই যে ভীমভবানী পিল দেখছেন—আগেই বলে রাখি এটা ওষুধ নয়।" বলে মরণ পণ্ডিত ঝট ক'রে টিনের স্যুটকেসটা খুলে একটা শিশি বার ক'রে উঁচু ক'রে চারিদিকে দেখাতে লাগল।

—"আপনারা বিশ্বাস করুন এটা ওষুধ নয়, সালসার সার। ব্যবহারের সুবিধার জন্য বটিকার রূপ দেওয়া হয়েছে।"

ইতিমধ্যে অনেকগুলি হাত এগিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য এরা কেউ ক্রেতা নয়। বিনা পয়সায় ওষুধের কার্যকারিতা পরখ করবার জন্য যে বিতরণ হয়—এরা তারই খরিদ্দার। মরণ পণ্ডিত এই কাজে মাথার চুল পাকিয়েছে, সে হাত-পাতার ভঙ্গিতেই মানুষ চেনে। অদ্ভুত কৌশলে এইসব বিনামূল্যের প্রার্থীদের বাদ দিয়ে আসল মানুষকে বড়ি বিতরণ করে। তার ক্ষিপ্রতা বোধকরি ট্রেনের গতির চেয়ে খুব কম নয়। ভীমভবানী বটিকায় গুণাগুণ বেশি ক'রে বলা প্রয়োজন—এটা যে ভাস্কর-লবণের সঙ্গে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, এফ, মিশ্রিত ক'রে পরম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী তা যিনি ব্যবহার করেছেন তিনিই জানেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ।

...বিরাট লম্বা দরবার কামরা। কম ক'রে আশী-নব্বইজন যাত্রী। ওদিকে আর একটি ক্যানভাসার উঠেছে—তার পণ্য হচ্ছে রেশন ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি। বেচারী পারবে কেন মরণ পণ্ডিতের গলার জোরের সঙ্গে পাল্লা দিতে। তার ওপর বর্ষাকালে বাংলা দেশে একটু আধটু পেটের গোলমাল কার না আছে।

হ'ল, এক গাড়িতেই পাঁচটা ভীমভবানী বটিকা আর চারটে মাজন বিক্রী হ'ল।

গায়ক ছোকরা রামপ্রসাদ সপ্রশংস দৃষ্টিতে মরণের স্যুটকেসটা দেখছিল। এতক্ষণে তার চানাচুর শেষ হয়ে গেছে। দু'পয়সার প্যাকেটে ক'টাই বা দানা থাকে! রামপ্রসাদ ভাবছিল ভীমভবানী বটিকা একটু চেখে দেখলে মন্দ হয়না। কিন্তু সংকোচ হচ্ছিল হাত পাততে। বাড়ীতে বৌঠাকরুণের অম্বল বারোমেসে ব্যামো—একটা যদি ভীমভবানী খাওয়ানো যায় তাতে হয়ত কিছু ফল হ'তে পারে।

অবশেষে স্থির হ'ল রামপ্রসাদ সেন গান গেয়ে ভিক্ষে করা ছেড়ে দেবে।

মরণ পণ্ডিত এরই মধ্যে রামপ্রসাদকে নাকি রীতিমত স্নেহ ক'রে ফেলেছে।

রামপ্রসাদও স্বীকার করেছে ব্যবসায়ের তুল্য আর কিছুই নয়। কতদিন ধ'রে রামপ্রসাদের মনে ব্যবসায়ের বাসনা পোষা রয়েছে, কিন্তু অভাবের সংসারে একসঙ্গে পাঁচটা টাকা জড়ো করা আজ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি, তাই রামপ্রসাদকে গলাবাজী ক'রে খেতে হয়। তার মনে খুব বড় দুঃখ, সে বললে—"দেখুন মশায়—কণ্ঠ হচ্ছে সম্পদ। আমাকে যে বৈরিগী বাবা গান শিখিয়েছিলেন, তিনি আদর করে নাম দিয়েছিলেন রামপ্রসাদ সেন। আমার পৈতৃক উপাধি চক্রবর্তী।"

—"বলিস কি রে আমাদের ব্রাহ্মণ তুই—হ্যাঁ খোকা?"

—"আমার বাবা ছিলেন সাধক মানুষ। তিনি জাতিবিচার করতেন না—মানুষ খুঁজে বেড়াতেন। তা সেই রামদাস বাবাজী আমাদের বাড়ি অনেক-কাল ছিলেন।"

—"আচ্ছা, তাহলে তোমাদের গোত্রটা কি হ'ল।"

—"ওসব জানিনে—বৌদি বলতে পারবেন। আমি শুধু গান গেয়ে

বেড়াই। বাবার ইচ্ছে ছিল আমাকে সাধকগায়ক করবেন। লেখাপড়া হ'ল না। আবার সাধনাও হ'ল না!" বলতে বলতে রামপ্রসাদের দৃষ্টি কেমন ছল-ছলিয়ে এল।

মরণ পণ্ডিত হাসলো—"তোর বয়সই বা কত! এখনই এত খেদ, হাঁ রে খোকা!"

—"আজ্ঞে বয়েস আবার হয় নাকি। মানুষ হওয়া না হওয়ার সঙ্গে বয়েসের কি সম্বন্ধ বলুন?"

—"আমি তোর ভার তুলে নেবো! হাঁ, যা বলছিলাম—তুই আমার সঙ্গে থাকবি। তোকে আর কিছু করতে হবে না। ছাখ, আমরা গরীবগুর্বো। ভগবান আমাদের শক্তি ছাননি। কিন্তু একেবারেই কি অক্ষম ক'রেছেন? তাহলে আর দয়া কোথায় তাঁর। আমাদের যতটুকু ক্ষ্যামতা আছে তাই দিয়ে মানুষের সেবা করব, কি বলিস?"

রামপ্রসাদ বুঝতে পারে না, মরণ পণ্ডিতের কথা, তবে কথাগুলো বেশ ভালোই লাগছে তার। সে সায় দিল ঘাড় কাৎ ক'রে।

—"আহা তাই বলি, রতনে রতন চেনে। ক'দিনই দেখছি তোকে রে! আমার মনে হচ্ছিল, আমাকে কেন তুই আকর্ষণ করছিস—কিসের টান! এখন বুঝছি পূর্বজন্মের সুকৃতি।"

"তাই নাকি!" সরল আয়ত দৃষ্টিতে রামপ্রসাদ তাকাল।

মরণ পণ্ডিত বললে—"আমার এই যেসব ওষুধ—এগুলো স্বপ্নাদ্য। একেবারে স্বপ্নে পাওয়া দৈব। তা আজকালকার মানুষ ত দৈবটৈব মানে না! সেইজন্য বিজ্ঞানের বুজরুকী, বুঝলি খোকা। মায়ের আদেশ, এইসব ওষুধের প্রচার করতে হবে। আমি একা ত আর পেরে উঠি নে। তাই মনে করছিলাম—"বলে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে গেল।

রামপ্রসাদ বললে—"কি মনে ক'রেছিলেন ঠাকুর?"

—"শুনবি নেহাতই। তবে শোন—যদি এমন কাউকে পাই, যে নাকি এই ওষুধের মাহাত্ম্য গান গেয়ে শোনাতে পারে, তাকে না হয় কিছু কিছু দিলাম,

আমারও এই জীবদেহ ধারণের জন্য কিছু রাখলাম—এই আর কি। তা তোকে দেখে মনে হয়ে গেল—এই ঠিক যেন তোর কথাই ভেবেছি আমি—মানে, মায়ের ইচ্ছে আর কি।"

রামপ্রসাদ অভিভূত হয়ে পথের পাশের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে পড়ল।

মরণ পণ্ডিত বুঝল, ওষুধ ধরেছে। রামপ্রসাদকে হাত করতে পারলে তার কারবারে লক্ষ্মী বাঁধা পড়তে বাধ্য। সত্যি কলকাতার রাস্তায় গান গেয়ে হিন্দুস্থানী ফেরীওয়ালারা কী পয়সাটাই লুটে নিয়ে যায়।...ঠিকমত খেলিয়ে তুলতে পারলে—রামপ্রসাদকে আরও বড় কাজে লাগানো যেতে পারে। ছেলেটিকে সত্যিই মরণ ভালবেসেছে।

রামপ্রসাদ চুপ ক'রে ছিল।

মরণ বললে—"চা খাবি?"

—"একটু জল।"

—"ওহে হুতোঁড় চা দাও তো ভাই।"

চা পানের সময় মরণ জানিয়ে দিল—দৈনিক নগদ এক টাকা ক'রে রামপ্রসাদ পাবে। পরিবর্তে গান গাইতে হবে। রামপ্রসাদ রাজি হয়ে গেল এক কথায়। তার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা, হাত পাত্তে হবে না লোকের কাছে।

গান গাইতে পেলে সে আর কিছুই চায় না, কিন্তু গাইবার পর ভিক্ষাবৃত্তিটুকু রামপ্রসাদের তরুণ মনে আঘাত করে খুব বেশী। মরণ পণ্ডিতের প্রস্তাব খুবই লোভনীয় সন্দেহ নেই।

চায়ের দোকানে দাম মিটিয়ে দিয়ে মরণ বললে—"ব্যাপারটা হবে এই রকম, বুঝলে বাবাজী। আমি একটা গান বাঁধব। দু'জনে মিলে খুব একটা লাগসই সুর দিতে হবে—তুমি দরদ ঢেলে দিয়ে গাইবে। কেমন?"

—"আচ্ছা। কিন্তু তাতে কি হবে?"

—"হবে, মানে ওষুধ বিক্রীর জন্যে। কথায় বলে না, আগে স্নেক—পরে ড্রিক।"

রামপ্রসাদ কিছু বুঝল না, মরণ পণ্ডিতের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

গঙ্গা থেকে খুব দূরে নয়—তবে শ্রীরামপুর শহর থেকে রীতিমত দূরে মরণ পণ্ডিতের চারচালা বাড়ি। বেশ ফাঁকা, কাছাকাছি বিশেষ বসতি নেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে উঠেছে—জোনাকীর মিট-মিটে আলো এখানে জ্বলছে; ঝিঁ-ঝিঁর ডাক শান্ত পরিবেশকে যেন আরও ঝিমিয়ে দিচ্ছে।

মরণ পণ্ডিত হঠাৎ গলা চড়িয়ে হাঁক দিল—"ওরে ও মাধু আলো আ্যাখ!"

—"যাই বাবা!" জবাব দিল মাধু। তার পরও মিনিট চারেক কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না।

রামপ্রসাদ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—"হাঁ পণ্ডিতমশাই, নটা তেত্রিশের গাড়ী ধরতে পারব ত'?"

—"আরে হ্যাঁ খুব পারবি! এই ত এখান থেকে একটু টেনে হাঁটলে ইস্টি-শনে চলে যাবি আধ ঘণ্টার মধ্যে।" তারপর অন্ধকারে আর একটা হাঁক দিল—"কি হ'ল রে, ও মাধু!"

—"এই যাই বাবা একটু দাঁড়াও, ভাতের ফ্যান ঝরিয়ে যাচ্ছি।"

—"তাড়াতাড়ি দেখবি আয়—"

আলো হাতে বছর আঠারোর একটি কৃশকায়া মেয়ে বেরিয়ে এল। হ্যারি-কেনের আলোতে বেশ বোঝা গেল, অতিথিকে খুব খুশি মনে অভ্যর্থনা করতে পারছেনা সে।"

মরণ একগাল হেসে বললে—"দ্যাখ মাধু এ হচ্ছে একেবারে রামপ্রসাদ সেন—গায়ক রামপ্রসাদ-এর নাম শুনেছিস ত, এ সেই গায়ক রামপ্রসাদ।"

মাধু গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল—"রাত্রে থাকবে নাকি?"

মরণের আগেই রামপ্রসাদ ব্যাকুল কণ্ঠে জবাব দিল—"না, ন্, না, দা-দ্-দ্-া ব-ব-ব-বো—দি-ই-ই দূর—"

মাধু হঠাৎ আলো হাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রুক্ষ-কণ্ঠে বাধা দিয়ে বলল—"তোত্‌লা! তুমি চুপ করো, আমার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি!" তারপর মরণকে আবার সে প্রশ্ন করল, "তোৎলাটা রাত্রে খাবে থাকবে ত? না কি। চুপ ক'রে আছ কেন?"

মরণ বললে—"দেখি, ওদের বাড়ি বস্তিবাটী। বাড়িতে কিছু ব'লে আসে নি কিনা। নইলে থেকে যেতে পারলেই ভালো হ'ত।"

মাটির উঁচু দাওয়াতে শেতলপাটী পাতা রয়েছে। সেইদিকে ইঙ্গিত ক'রে মাধু বললে—"বস রামপ্রসাদ। চা খাও?"

—"এখন আর চায়ের ক্যাচাং করতে হবে না, পথে সেসব সেরে নিয়েছি আমরা। তুই আমার সেরেস্তাটা বার করে দে।"

ব'লে মরণ স্মিত মুখে মেয়ের পানে তাকাল।

—"দু'দণ্ড ব'স ত বাবা। বাড়িতে পা দিতে না দিতে সেরেস্তা চাই, ইটাট পত্তর ছাড়া এক দণ্ডও কি থাকতে নেই?"

মাধুর পুরো নাম মাধুরীলতা। কিন্তু তার কণ্ঠের কোথাও মাধুর্য আছে ব'লে মনে হয় না। রামপ্রসাদ কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে। ব'সে ব'সে ঘেমে উঠল সে।

মরণ পণ্ডিত কিন্তু মেয়ের আচরণে কিছুমাত্র বিচলিত নয়। সে আরও মিষ্টি ক'রে ব'ললে—"কাজ ছাড়া কি বাঁচা যায় রে পাগলী! আর এই যে শ্রীরামপ্রসাদ শর্মাকে এনেছি, ওকে নিয়ে একটু বসতে হচ্ছে। বুঝলি না—গানের সুর লাগাতে হবে। এই বুঝে ত্যাখ, ওষুধের জন্যে গান বাঁধতে হবে, সেই গানে আজ রাত্রেই রামপ্রসাদের সঙ্গে বসে সুর দিয়ে একেবারে তৈরী করা! মানে রামরাত্রি প্রভাত হ'লে কালই আমাদের নতুন সুরের গান গেয়ে ওষুধ বিক্রী সুরু করব। বুঝলি কিছু? দেখি এবারে সেই ভদ্রকালীর পত্তাকীচরণ, রিষড়ের নিতাইপদ, আর তোর ওই মিষ্টার দে চৌধুরীর কারবার কোথায় তলিয়ে যায়।"

যদিও মাধুরী দে চৌধুরী বা নিতাইপদ কাউকে কোন দিন চোখেও দেখেনি তবু এদের সকলকেই ও চেনে। বাবার কাছে এদের কথা কত যে শুনেছে তার ঠিক নেই। পিতা ও কন্যার এতটুকু সংসার—কাজেই পরস্পরের কথা কওয়ার দ্বিতীয় কোনো প্রাণী নেই ব'লে যা কিছু আলাপ-আলোচনা দু'জনেই নিবদ্ধ।

মাধুরী হেসে উঠল। ওর উচ্চকণ্ঠের হাসি যেন শান্ত পরিবেশকে নাড়া দিয়ে গেল—"ওঃ, বাবা গো! আর পারি না—তোমার ওই পুচকে একরত্তি

তোৎলা হ'ল সম্বল। আচ্ছা বাবা, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল সত্যি-সত্যি।"

মরণ পণ্ডিত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।—"দিনদিন তুই ভারি বেয়াড়া হচ্ছিস মাধু। বার বার অমন মুখের ওপর তোৎলা-তোৎলা ব'লে উপহাস করতে তোর এতটুকু বাধছে না? ছি ছি।"

—"হ্যাঃ, বেশ করেছি বলেছি। তোমার ব্যবসাবুদ্ধি যেমন—বলবে না ত কি?". প্রসঙ্গটা ওখানেই তখনকার মত চাপা পড়ে গেল।

রামপ্রসাদ যখন গানের সুর লাগিয়ে দু'বার গেয়ে শোনালো তখন মরণ পণ্ডিত ওর পিঠ চাপড়ে বললে সোৎসাহে—"এই ত চাই—এই ত চাই।"

রামপ্রসাদ উঠোনে নেমে জোড় হাতে নমস্কার ক'রে বিদায় নিল।—"তাহলে পণ্ডিত মশাই এখন আসতে আজ্ঞা করুন। কাল সকালের লোকালে বস্তিবাটীতে দেখা হবে।"

মাধু বোধকরি আশপাশেই ছিল, সহসা সামনে এগিয়ে এসে বললে—"এত রাতে কোথায় যাবে?"

অপ্রতিভভাবে রামপ্রসাদ বলল—"বাড়ি যাব।"

—"গাড়ী নেই, শেষ গাড়ী চলে গেছে আধ ঘণ্টা আগে। আর লজ্জায় কাজ নেই, রাতের মত এখানেই থেকে যাও।"

—"না, আমাকে যেতেই হবে।"

—"ও বাবা! তাই নাকি। তাহলে ভাত খেয়ে রওনা হওয়াই ভালো। বাস যদি পাও তবে সেও ত এক ঘণ্টার ধাক্কা। মুখ ত শুকিয়ে আমসী হয়েছে এদিকে।"

—"না আমি যাই। খেতে গেলে আরও দেরী হয়ে যাবে।"

—"তেজ আছে দেখছি। দাঁড়াও, ঠাঁই হয়ে গেছে, এখন না খেয়ে যেতে পাবে না, আমার হুকুম।"

রামপ্রসাদ অন্ধকারে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

মাধুরী তার বাবাকে বললে—"ইনি আবার মা-মনসা! ওই যে তোৎলা বলেছি, সেই রাগে, না-খেয়ে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছেন, বুঝলে বাবা।"

—"আঃ, তুই বড্ড বাজে বকিস।" বললে মরণ পণ্ডিত, যাত্রপত্র গুছিয়ে ঘরে তুলতে তুলতে।

ছোট্ট সংসার। মরণ পণ্ডিত আর মাধুরী এ ছাড়া দু'টি গরু আছে। ঝি-চাকর নেই, সম্ভবতঃ অবস্থা ওদের তত ভালো নয়।

আহারাদির পর রামপ্রসাদ আর দাঁড়াল না। হনহন করে অন্ধকারেই চলতে শুরু করে দিল। কিন্তু দু'চারপা এগুবার পর পিছন দিক থেকে আলো এসে পড়ল সামনে। চাঁদ উঠল না কি!

হঠাৎ শোনা গেল—"শোনো, এরপর থেকে এরকম হট-হট ক'রে রাত্তিরে আঁধারে এবাড়িতে চলা ফেরা কর না।"

চমকে ফিরে তাকাল রামপ্রসাদ, দেখল হারিকেন হাতে করে মাধুরী দাঁড়িয়ে আছে। রামপ্রসাদের গতি ব্যাহত হল। মাধুরী বলল—"এখানে বড্ড সাপ। এই গত চৈত্রে আমার আট বছরের ছোট ভাইকে এমন ছোবল দিল, আহা· ওইটুকু কচিপ্রাণ—নীল হয়ে গিয়েছিল, মা গো!" পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—"অবিশ্যি তারপর গোটা পাঁচেক গোখরো মারা পড়েছে। এখনও আছেন তাঁরা। আমি মা মনসার দয়ায় ভয়ে ভয়ে টিকে আছি। যাও, রাত অনেক হয়েছে।"

রামপ্রসাদ ভেবে পেল না কি বলা উচিত। চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল।

মাধু আবার বলল, "এসো এখন। আমি সদররাস্তায় একা-একা রাতে যাইনে, নইলে একটু এগিয়ে দিতে পারতাম। ছাখো দিখিন, বাবার যত কাণ্ড, গান বাঁধো তার সুর দাও সব এখুনি এখুনি! কেন, কাল হলে কি হত। যাক—যাও, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না।"

ফিরে এসে মাধু তার পিতাকেও যথেষ্ট ভর্ৎসনা করল। মরণ পণ্ডিত মুখ বুজে সব শুনে-শেষকালে বললে, "গলাটা কেমন বল দেখি!"

—"গলাটা বেশ ভালো বাবা! পাখীর মত গান গায় যখন, তখন কে বুঝবে যে একটা কথা বলতে গেলে সাত ঘণ্টা ত-ত-ত-ত করতে হয়।"

—"আবার। তোর ওই বড় দোষ মাধু, মানুষের ভালোটা দেখতে পাস নে!"

ছ মাস পরের কথা।

সেদিন রামপ্রসাদ একগাদা মালপত্র নিয়ে একাই এসে ঢুকল, তখনও বে বেলা রয়েছে।

মাধুরী গোয়াল ঘরে কাজ করছিল। ভেতর থেকেই সাড়া দিল, "বে পেসাদ এলে?"

রামপ্রসাদ সাড়া দিল না। মাধুরী নিজের মনেই বলল, "এখন একটু চেপে ব'স, আমার এদিকের কাজ চুকিয়ে যেতে একটু দেরি হবে।"

মিনিটখানেক পরে আবার প্রশ্ন করল, "বাবা কখন আসবে কিছু বলেছে?"

এবারে রামপ্রসাদ কথা বলল, "আমি এসেছি কি করে বুঝলে, হাঁ মাধু?"

মাধুরী জবাব দিল না, একটা চাপা হাসির মিহি শব্দ শোনা গেল।

রামপ্রসাদ বললে, "তোমার খুব বুদ্ধি। বুঝলে মাধু।"

—"ছাখো, বাবার মত কথায় কথায় মাধু-মাধু করনা। আমার নাম মাধুরীলতা।" বেশ ঝাঁঝালো স্বরে বললে মাধু।

রামপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—"আমি যে তোৎলা, অতখানি নাম বলা যায় বুঝি!"

—"তোৎলা তাই কি হয়েছে? তাই বলে কি মাধু বলা ভালো।"

—"তবে কি দিদি বলব?"

—"আহা কচি খোকা—শোনো কথা, আমি ওঁর দিদির বইসী। বলি মেঘে মেঘে বেলা বুঝি হয়নি?"

এবারে রামপ্রসাদ প্রমাদ গণল। তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সে বুঝে উঠতে পারছে না, মাধুরী ঠিক কি বলতে চায়।

এমন সময়ে দুধের বালতি হাতে মাধুরীলতা গোয়াল থেকে বেরিয়ে এল। গাছকোমর করে কাপড় পাক দিয়ে বেশ আঁট করে জড়ানো। ওর কপালের শ্যামল মসৃণ ত্বকের ওপর কয়েক বিন্দু মুক্তার মত ঘাম ফুটে উঠেছে। পরিশ্রমে আরক্ত মুখ। নিরাভরণবাহু প্রান্তে ছাঁদন দড়ি—বালতি। রামপ্রসাদ ফ্যাল ফ্যাল করে সরল তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিতে দেখছিল।

মাধু বললে, "ভারি ইয়ে হয়েছে দেখছি।" ওর ওষ্ঠপ্রান্তে একটু কপট হাসি, "আচ্ছা পেসাদ, তুমি গায়ক মানুষ একটুও রসবুদ্ধি নেই কেন। মাধু-মাধু বলো, কেন লতা বললে কি ক্ষতি হয়।"

রামপ্রসাদকে কেউ যেন অলঙ্ঘ্য কঠিন একটা শাস্তি বিধান করেছে এমনই মুখ করে বললে, "বেশ তাই হবে।"

—"কি কথার ছিরি। তাই হবে।"

—"এখন একটু এসে জিনিস পত্তর দেখে নাও।"

—"কেন অত তাড়া কিসের শুনি।"

—"বাড়িতে আজ সত্যনারাণের শিন্নি আছে কিনা, বৌদিদি সকাল সকাল ফিরতে বলেছিলেন।"

—"আচ্ছা-আচ্ছা হবে, হবে, একটু সবুর করো।"

গাঁঠরী খুলে মাধুরী অবাক হয়ে গেল। দুখানা শাড়ী, দুখানা ধুতি, বড় বড় বড় দুখানা গামছা। তাছাড়া ঘর-গৃহস্থালীর আরও অনেক রকম জিনিসপত্র।

রামপ্রসাদ বললে "পণ্ডিত মশাই আজ হাওড়া হাটে গিয়েছিলেন কিনা।"

—"ও। তা এখন তিনি কোথায় গেলেন?"

—"বালি উত্তরপাড়ার ওধারে কোথায় জমি দেখতে গিয়েছেন। ফিরতে একটু রাত হবে বলেছেন।"

—"রাত হবে বলেছেন, আর তুমি সব জেনেশুনে আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছ? কেমন পুরুষ মানুষ?"

—"বাঃ, আমাকে যে বৌদিদি আগে থেকে বলে দিয়েছেন সকাল সকাল বাড়ি যেতে।"

—"উঃ কী আমার কাজের লোক। বলি, বৌদি পুজোটা তোমাকে করবেন, না, সত্যনারাণ ঠাকুরকে—"

—"যাক গে বাবা, আমি তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না। এখন হুকুমটা কি বলো।"

—"হুকুম করার আমি কে? আঁধারে একা এই তেপান্তরে পড়ে থাকি

না কেন। যাও বাড়ি গিয়ে তোমার বৌদির আঁচল ধরে বসো গিয়ে বুড়ো খোকা।"

বিব্রত রামপ্রসাদ কাঁচু-মাচু হয়ে বললে—"সত্যি মাধু, আমার মাথাটা মোটা সবাই বলে, মিথ্যে রাগ কর না। এই ত বললে কথাটুকু, বুঝতে পারলাম—এখন আর যাবো না।"

—"আবার মাধু বললে যে বড় ?"

—"লতা বলতে কেমন-কেমন লাগে। আচ্ছা বলব—লতা, লতা, লতা।"

—"থাক, ন্যাকামী রেখে এবার মুখ হাত ধুয়ে এসো।"

—"চা দেবে ?"

—"না, অত বারবার চা খায় না। ও বেলার দুটি ভাত রয়েছে একটু দু জল দিয়ে দিচ্ছি, দলপুরু খাওয়া খাও দেখি।"

ইদানীং মরণ পণ্ডিতের অবস্থা ফিরেছে। বেশ দুপয়সা হচ্ছে। তার কথাবার্তা চালচলনেও তা গোপন নেই। রামপ্রসাদেরও এতে খুব আনন্দ সবাইর কাছে গল্প করে বেড়ায় সে উঁচু গলায়।

সন্ধ্যা নামল। শান্ত নির্জন আকাশে একটি একটি তারা ফুটছে। রামপ্রসাদ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

মাধুরীলতা সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিল। রান্না চড়িয়ে এক সময়ে সেও এসে বসল।

মাধুরী এসে বসতেই রামপ্রসাদ কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ল—অথচ কিছুই তার করবার নেই।

আস্তে আস্তে মাধুরী বললে—"ন্যাখো পেসাদ, তুমি, বাজে কাজ ছেড়ে দাও।"

—"কি কাজ ছাড়ব ?"

—"এই ওষুধের ফিরিওলার গান গাওয়া চাকরী।"

—"ছেড়ে দিলে খাবো কি ?" অসহায়ভাবে রামপ্রসাদ বললে "কেন, পণ্ডিত মশাই বুঝি কিছু বলেছেন ?"

—"না, পণ্ডিত মশাই কেন বলবে, তার স্বার্থে সে তোমায় বাঁধছে, আমি বলছি। আমার খুব খারাপ লাগে। তোমার অমন গলা—সে কি

শুধু এই বাজে, ওষুধ বেচার জন্যে! না, না, পেসাদ তুমি এ কাজ আর করনা।"

রামপ্রসাদ বুঝতে পারে না মাধুরীর কথার মর্মার্থ।

সে করুণ কণ্ঠে বললে, "আমার এ চাকরী গেলে বাড়িতে বিধবা বৌদিদি যে উপোস করে মরবে মাধু!"

—"আবার তুমি—"

"না না, লতা। আর ভুল হবে না—লতাই বলছি ত। তুমি বুঝবে না আমরা কত গরীব।"

—"আমি খুব বুঝতে পারি। আমাদের অবস্থাই বা কি ছিল—চাল ছাইবার খড়ের পয়সা জুটত না। সাপের আড্ডায় প্রাণ হাতে করে এখনও দিন কাটে। তাই বলছি এত করে। আমার বাবা, তোমার ওই পণ্ডিত মশাই ত সেদিন বলছিলেন—কলকাতায় রেডিওতে একখানা গান গাইলে তোমার এখানকার এক মাসের মাইনের সমান টাকা আর একবার ফিলিমে ঢুকলে হাজার হাজার টাকা।"

—"সেসব বড় বড় কথায় আমাদের কি কাজ। সহর বাজারের কাণ্ডই আলাদা—ওসব হচ্ছে বড় লোকেদের ব্যাপার। তবে শোনো। বলি—' একবার চন্দননগরের এক বাবু, আমার গান শুনে বললেন, সিনেমার গেটম্যান করে দেবেন, মাসে পঁয়তিরিশ টাকা মাইনে। বললেন, ওই গেটম্যান হয়ে ঢুকলে একদিন আমি কেষ্টবিষ্টু হয়ে যেতে পারি। দুর্গাদাস বাঁড়ুয্যে না কে খুব বড় সাহেব, তিনি নাকি থিয়েটারের সিন আঁকতেন। তারপর সেইসব শুনে আমার মহা আনন্দ। তিনি বললেন, অমুক দিন বেলা তিনটের সময় যেন আমি চন্দননগর টকী হাউসের টিকিট ঘরের সামনে হাজির থাকি। তা বুঝলে—বেলা তিনটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে গায়ে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরলাম—সে বাবুর আর দেখা পেলাম না। ওসব আমাদের কম্ম নয়!"

—"না না পেসাদ সত্যি বলছি। তুমি চেষ্টা করে গ্যাখো একবার—একবার কলকাতা গিয়ে। আমি বলছি তোমার হবে।"

রামপ্রসাদের সন্দেহ হল মরণ পণ্ডিতের এই প্রবলা কন্যা তাকে তাড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর। মাধুরীলতার মুখের ওপর কথা বলার সাহস আর যারই থাক না কেন রামপ্রসাদের নিশ্চয়ই নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। ভাত পোড়ার গন্ধ ভেসে আসতে রামপ্রসাদ উৎকন্ঠিত হয়ে বললে, "দ-দ-দ তা উনুনে যেন ভাত পুড়ছে।"

মাধুরী অপ্রসন্ন মুখে উঠে গেল—"ওই জন্যে কয়লার আঁচে ভাত রাঁধি না। আঁচ ত নয় রাবণের চিতা—হাঁ হাঁ করে জ্বলছে। আমার ওই কাঠের জ্বালানীই ভালো। কয়লার আগুনে কোনদিন আমি নিজেই না পুড়ে মরি—আগুন যেন গিলতে আসে।"

মরণ পণ্ডিতের বিশ্বাস কাঠের জ্বালের সামনে দুবেলা অনবরত বসে থেকে থেকে মাধুরীলতার রঙ ময়লা হয়ে যাচ্ছে। সেই হেতু এবারে দু মণ কয়লা সে ঘাট মাঝিদের কাছ থেকে বেশ চড়া দামেই কিনে দিয়েছে। মরণ পণ্ডিত মেয়েকে স্নেহ করে সন্দেহ নেই।

প্রথম যখন রামপ্রসাদকে সে কাজে বহাল করেছিল তখন মনের গোপন কোণে একটা বাসনা ছিল এই সরল কিশোরসদৃশ তরুণটিকে একদিন জামাতাতে রূপান্তরিত করার—কিন্তু বর্তমানে সে দু-এক জায়গায় মেয়ের জন্য পাত্র দেখছে এবং কথাবার্তা চালাচ্ছে। সম্ভবতঃ সহসা এই উন্নততর অবস্থার জন্যই ত্রিশটাকা মাইনের চাকরকে জামাই করার কথা আর প্রশ্রয় দিতে চায় না মরণ।

ভাত নামিয়ে রেখে মাধুরীলতা ফিরে এল। তার কণ্ঠস্বরে এতটুকু মিষ্টতা নেই, বললে "আচ্ছা পেসাদ, সন্ধ্যেবেলা একটা রামপ্রসাদী গান কি গাইলে দোষ হবে? না তোমার পণ্ডিত মশাই বুঝি দিব্যি দিয়ে বারণ করেছেন ফেরিওলার গান ছাড়া আর কিছু গাইবে না।"

রামপ্রসাদ লজ্জিতভাবে বললে—"ওসব পাট উঠে যেতে বসেছে। কখনই বা গাই আর কে-ই বা শোনে।"

—"নিজের গান নিজে শুনলেও ত পার? আমি না হয় শোনবার মত মানুষ নই।"

—"তুমি বড় চোখা-চোখা কথা শোনাও লতা। আমি যে কী তোমার বিষ দৃষ্টিতে পড়েছি, কি যে আমার অপরাধ বুঝতে পারি নে।"

মাধুরীলতার মুখে যে হাসি ফুটে উঠল চাঁদের আলোতে তা বোধহয় রামপ্রসাদ দেখতে পেল না।

এরপর একদিন রামপ্রসাদের মাইনে নিয়ে তুমুল ঝগড়া করল মাধুরীলতা তার বাবার সঙ্গে।

শুরু হয়েছিল এইভাবে—"পেসাদ আমার কাছে বলছিল, মাইনে না বাড়ালে ও চলে যাবে।"

মেয়ের কথাতে মরণ পণ্ডিত বক্রহাসি হাসল—"আজকাল বুঝি তেল বেঁধেছে?"

—"সত্যি এমন ত অন্যায্য কিছু বলে নি সে। বাবা, দাও না ওকে দিন দুটাকা করে।"

—"কেন, কেন দুটাকা করে দিতে হবে শুনি?"

—"যার দৌলতে তোমার এত বাড়বাড়ন্ত তাকে হাতে তুলে দিতেই যত কষ্ট।"

এমনিতে মরণ পণ্ডিতের মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। কিন্তু আজ মেয়ের কথায় সে যেন তেলেবেগুনে জলে উঠল, "বলি দৌলতটা তাহলে ওই শুঁটকো তোৎলা চ্যাংড়ার, না?"

—"ছাখো, অমন তোৎলা-তোৎলা বল না বাবা। মানুষের ভালোটা দেখতে হয় আগে।"

—"থাম তুই।"

—"কেন, থামব কিসের জন্তে শুনি! যাধু যা ভালো বোঝে তা বলবেই। বাইরের লোকে যা বলে বলুক, আমার চোখের সামনেই ত সব হয়ে উঠল। তুমিই না বলতে—রামপ্রসাদ না থাকলে পথে বসতে হত। ঘে চৌধুরী, পতাকীচরণ, নিতাইপদ সবাইকে ঠাণ্ডা করে দিল একরত্তি রামপ্রসাদ।"

—"বেশ, বলিছি বলে তাই কি—!"

—"কিছু না। ওর মাইনে ষাট টাকা করতে হবে।"

—"ওর মাইনে তিরিশ টাকার এক কড়া বেশি দেবোনা, না পোষায় পথ দেখতে বলো।"

—"আচ্ছা তাই বলে দেবো।"

—"মনে হচ্ছে এতে তোমার সায় আছে—"

—"এতদিন সায় ছিল, এবার উঞ্ছানি দেবো। গরীবের পয়সা হলে যে এমন অর্থপিশাচ হয়, তা কে জানত।"

এরপর আর মাধুরীলতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। দুম-দাম কিল-চড় কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়ে মরণ পণ্ডিত গাঁজার কল্কেতে মনোযোগ দিল। গাঁজাটা সে সম্প্রতি ধরেছে। কোন কবরেজে নাকি বলেছে যে, গাঁজাতে হৃদ্‌যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

প্রাত্যহিক নিয়মে রামপ্রসাদ ওষুধের ঝুলি এবং দৈনন্দিন জিনিসপত্র মনিব বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। অবশ্য মাধুরীলতার ভাণ্ডার থেকে জল-খাবারটা প্রায় ভরপেটই আসে। রামপ্রসাদের প্রাক্তন অভুক্ত কৃশতাজনিত কৈশোর ভাব আর নেই, দেহের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে সে এখন সতেজ বাঁশ গাছের মতই মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

অন্যদিন রামপ্রসাদের জলখাবার চুকে যাবার পরই মাধুরী বিনা ভূমিকায় বলে, "ভোজন হল এবার গাজন হোক।"

আজ কিন্তু সেসব কিছুই বলল না মাধুরী। কেমন যেন থম-থমে মুখে এসে একবার দাঁড়িয়ে চলে গেল। রামপ্রসাদ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না গান গাইবে কি গাইবে না। অবশেষে মৃদুকণ্ঠে একটা কলি ভাঁজতে লাগল। তবু অপর পক্ষের কোনো সাড়া পেল না সে। অভ্যাসমত দু'খানা গান গাইল, তারপর উঠে পড়ল, "আলোটা একটু ধরবে? হাত খালি আছে?"

মাধুরী বিনা বাক্যব্যয়ে নতুন লণ্ঠন নিয়ে দাওয়া থেকে নেমে এল।

বাড়ীর সীমানায় দাঁড়িয়ে রামপ্রসাদ বললে "আচ্ছা আজ চলি।"

—"দাঁড়াও।"

রামপ্রসাদ থমকে দাঁড়াল।

মাধুরীলতা এগিয়ে এসে বলল, "একেবারে এতটুকু শব্দ কর না। এই টাকা রইল। তুমি কলকাতায় যাবে, রেডিও আর সিনেমায় কাজ যোগাড় করে নিও। কাল থেকে যেন এই কেরীওয়ালার তাঁবেদারী করতে এস না। মানুষের দাম যারা না বোঝে তাদের কষ্ট পাওয়াই ভালো।"

রামপ্রসাদ টাকা নিতে আপত্তি করল। কিন্তু সাশ্রুনেত্রে মাধুরী বলল তার হাত চেপে ধরে—"পেসাদ, তুমিও তোমার দাম বুঝলে না! যেদিন বুঝবে সেদিনে একবার এই পাষাণী লতার কথা মনে কর তাহলেই আমি ধন্য হবো। আমি যা বলছি তা শুনে চল, দেখবে ভাগ্য ফিরে যাবে তোমার। যাও, আর দেরি কর না, যাও যাও।"

রামপ্রসাদ কাতরভাবে বলল, "এত টাকা আমি নষ্ট করতে পারব না। টাকা যে একবার গেলে আর ফেরে না লতা। কি করে শোধ দেবো তখন।"

—"আঃ, তুমি বড় ছেলেমানুষ পেসাদ। আমার এই এক জ্বালা হয়েছে, যা বলি শোনো। চলে যাও।"

—"যাবে না, দাঁড়াও। শয়তানের বাচ্ছা এখানে দাঁড়িয়ে কেষ্টো আল্লাদ হচ্ছে। শূয়ারের বাচ্ছা দাঁড়া বলছি।" পিছন থেকে মরণ পণ্ডিত গর্জন করে উঠল।

মাধুরীলতা দু'হাত বাড়িয়ে পিতার পথ রোধ করে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, "পেসাদ ছুটে পালাও। চলে যাও, চলে যাও।"

রামপ্রসাদের নিজের কোনো হঁস ছিল না, কোন এক রহস্যময় শক্তি তাকে প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়ে নিয়ে এল হাওয়ার বেগে, তা সে জানে না। ছুটতে ছুটতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়তে তখন সে বুঝতে পারল দম বন্ধ হয়ে আসছে। দ্রুতপদে হাঁপাতে হাঁপাতে সে পথ চলতে লাগল। পশ্চাতে যেন আর্তকণ্ঠে মাধুরীলতা তাড়া দিচ্ছে। চলে যাও—চলে যাও।

এক বছর পরে।

মরণপণ্ডিতের ভিটেতে রামপ্রসাদ আবার এল। এবারে তার বেশবাসে শহরে ছাপ, চেহারায় চাকচিক্য।

মাধুরীলতা গিয়েছিল গঙ্গায় জল আনতে। সাহেবী পোশাকের মানুষ দেখে মলিন আঁচলটা মাথায় তুলে দিল। পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পেরে মৃদু কণ্ঠে বলল—"রামপ্রসাদ! তাই বলো।" পেসাদ বলতে গিয়েও কেন যেন পারল না, কি রকম বাধ-বাধ ঠেকছে।

রামপ্রসাদ দেখল মাধুরীকে—বৈশাখের কৃষ্ণচূড়া যেন শীতের আকন্দের প্রভাহীন ম্লানিমায় পর্যবসিত।

কাঁখালের কলসীটা নামিয়ে রেখে মাধুরীলতা হাঁপাচ্ছিল। রামপ্রসাদ যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে। মরণ পণ্ডিত বাড়ি নেই—মাধুরীলতা একাই রয়েছে তবু রামপ্রসাদ সুস্থির হয়ে বসতে পারছে না। অথচ কলকাতা থেকে এখানে আসবার পথে ট্রেনে বসে কত ছবিই এঁকেছে। কেমন ক'রে মাধুরীকে এই একবছরের কাহিনী বলবে—মাধুরীর জন্য পোর্টেবল্ গ্রামোফোন কিনে নিয়ে এসেছে, আর এনেছে রামপ্রসাদের গাওয়া খান তিনেক রেকর্ড।

মাধুরী বলল, "যাক তাহলে মনে পড়েছে?"

—"পণ্ডিত মশাই কোথায়?"

—"কেন, ওষুধের ঝুলি ঝাঁপি নিয়ে বেরিয়েছেন।"

—"তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে! কোথায় হ'ল?"

—"যমের বাড়ি। সে খোঁজে তোমার কি কাজ? টাকা শোধ দিতে এসেছ বুঝেছি। তা দিয়ে চলে যাও।"

—"তুমি বুঝবে না লতা, কী কষ্টের মধ্যে দিয়ে প্রথম প্রথম দিন কাটত।"

—"আর আমার বুঝি ফুলশয্যায় কেটেছে। ভাখো দিকিন্, ঘরদোরের কী চেহারা হয়েছে। বাবার শরীরও ত—"

ব'লে নিজের অজ্ঞাতেই মাধুরী আপনার শ্রীহীন দেহের দিকে তাকাল। পরক্ষণে কোমল কণ্ঠে বলল, "তা দু'দিন থাকবে ত? বাঃ বেশ সুটকেশটি ত!"

—"এটি তোমার। সুটকেশ না, গ্রামোফোন। আর আমার গান রেকর্ডে উঠেছে, তাও এনেছি।"

—"ওসব আমার চিন্তেয় দিয়ো। এক বছরের মধ্যে একটি বার খোঁজ নিলে না! বেশ করেছ, এখন বিয়ে থা ক'রে রাঙ্গা টুকটুকে বৌ নিয়ে সুখে থাক।"

রামপ্রসাদ কিছুতেই বলতে পারল না যে, মাধুরীলতাকে বিয়ে করবার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে এসেছে আজ। একবছর ধরে প্রতিটি মুহূর্ত সে যে সেই আশা নিয়েই সংগ্রাম করেছে একথা বললে মাধুরী বিশ্বাস করবে? রামপ্রসাদ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মাধুরী এতক্ষণে ডাকল, "কি ভাবছ পেসাদ?"

রামপ্রসাদ চোখ তুলে তাকাল, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে সে বলল, "বড্ড দেরী ক'রে ফেলেছি লতা!"

'অম্লান চৌধুরীর নীতি এবং নিয়ম সম্পূর্ণ নিজস্ব। তার জীবনযাত্রার ধারায় অশান্ত উদ্দামতা থাকতে পারে কিন্তু গোপন কোনো চোরা কারবার নেই। তার ঘরে টেবলের ওপরেই মদের বোতল সাজানো থাকে। তার সন্ধ্যা কাটে না কোনো ভদ্র পরিবারের চায়ের মজ্‌লিসে তরুণীদের সঙ্গে চাহনীবিনিময়ের লুকোচুরিতে কিম্বা রাজনীতির আসরে। তার স্বাভাবিক কণ্ঠের সাধারণ কথাকে অনায়াসেই গলাবাজী বলা যায়। তার সঙ্গে সম্ভ্রম বজায় রেখে পথ চলা সহজ নয় কারণ কথায় কথায় গালাগালি করাটাই তার অভ্যাস। তবু অম্লান চৌধুরীর যারা অন্তরঙ্গ তারা তাকে তারিফ করে।

অম্লান সেদিন নির্মলের আফিসে এসে বল্‌লে—"আমি বিয়ে করব।"

যে কোনো বন্ধুর আফিসে অম্লান এলে একদিকে সেই বন্ধু যেমন খুশি হয় তাকে দেখে, অন্যদিকে তেমনি শঙ্কিত হয়ে ওঠে অম্লানের অসঙ্গত আচরণে আফিসের স্বাভাবিক শান্তি নষ্ট হওয়ার ভয়ে।

নির্মল তার ছেলেবেলার বন্ধু। অম্লানের অভদ্র আচরণের জন্য অনেক বার নির্মলের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, তবু অম্লানকে নির্মল ছাড়তে পারে নি।

নির্মল হেসে উঠ্‌ল—"যাঃ—"

—"যাঃ ব'লে উড়িয়ে দিতে চাও! এই ছাখো—"বলে সে পকেট থেকে এক গোছা এক শ' টাকার নোট বার ক'রে দেখিয়ে আবার রেখে দিল।"

নির্মল বল্‌লে—"যাঃ, ঘুষের টাকা পেয়েছিস, তা ও ত ওড়াবার জন্যে।

—"তোর বাবা হয়, দেবে দু'হাজার টাকা ঘুষ! শালা, দস্তুর মত বিয়ে করব ব'লে দরখাস্ত ক'রেছি তবে না কোম্পানী দু হাজার টাকা ধার দিয়েছে। তার সঙ্গে এক মাসের ছুটি নিতে হ'ল। এখন এই জঞ্জাল নিয়ে কি করি বল্ তো।"

নির্মল প্রশ্ন ক'রলে—"হঠাৎ এত টাকা কার জন্যে নিতে গেলি?"

—"আমাদের পাশের ঘরে হিরণ্ময় থাকে, সে বিয়ে করতে চায়—।"

—"তাই ব'লে আহাম্মকের মত ধার ক'রে বিয়ে।"

—"কি করবে, বেচারী ভালোবেসেই মরেছে।"

—"আরে ভালোবাসার কারবারে ধার-বাকীই ত একমাত্র স্থবিধে—এ যে দেখ্‌ছি উল্টো প্যাচ। কী ব্যাপার—"

অম্লান হেসে জবাব দিল—"তুই ভালোবাসার কি বুঝিস। কাউকে ভালোবাসার অনেক ফ্যাসাদ। সমাজের ভদ্র ব্যবস্থা—এখন হিরণ্ময় একটি ভদ্র জীব, তাকে সেই ভাবেই চল্‌তে হবে।"

নির্মল অধীরভাবে জবাব দিল—"দুত্তোর তোর বক্তৃতা রাখ্‌—আসলে কি হয়েছে তাই বল্‌। তুই বিয়ে করবি, না, ওই দু'হাজার টাকাই হিরণ্ময়কে দান করবি?"

—"হিরণ্ময়কে এক হাজার টাকা ধার দিচ্ছি—আমাকে সে প্রতি মাসে একশ' টাকা শোধ দেবে এক বছর ধ'রে—তা হ'লে ত্যাখো আমি পাচ্ছি ১২০০৲ টাকা, আর আমার আপিসে ন পাসে'ন্ট সুদ দিয়েও লাভ দাঁড়াচ্ছে এক'শ দশ টাকা। অথচ হিরণ্ময়ের বিয়েটা হ'ল—তার উপকার ক'রেও আমি লাভ করছি—"

—"যা দুনিয়ায় কোনো দিন হয়নি। পরের উপকার ক'রে নিজের লাভ অসম্ভব।"

—"অবিশ্যি হিরণ্ময় টাকা মারবার ছেলে নয়। কেন বলছি শোনো,—বরিশালে ওদের যে জমিদারী ছিল তার আয় ছিল মাসে তিন হাজার টাকা। বছর দশেক আগে ওর বাবা মারা গেলেন কলকাতায়, তখন ওর কাকা ছিলেন দেশে। দেশ থেকে তিনি কলকাতায় এলেন না, উল্টে টেলিগ্রাফ করে জানালেন হিরণ্ময়ের মা'কে 'তোমরা কলকাতাতেই দাদার শ্রাদ্ধ করো, তিনি গঙ্গা পেয়েছেন অতএব গঙ্গাতীরেই তাঁর শেষ কাজ হোক।' তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওদের দেশে যাওয়া তিনি নানারকম কায়দায় আটক রেখেছিলেন, বুঝলে! জমিদারীর আয় থেকে আর কিছু না, মাসে এক শ' টাকা পাঠাতেন—তাও যেদিন শুন্‌তে পেলেন হিরণ্ময় চাকরী করছে সেদিন থেকে সেটাও বন্ধ করেছিলেন।"

নির্মল বল্‌লে—"কিন্তু তাতে ক'রে হিরণ্ময় সম্বন্ধে কি বোঝা যাচ্ছে না যে সে আহাম্মক।"

—"বলি শোনো। তারপর যখন হঠাৎ তাঁদের জমিদারী ছেড়ে দেশঘর ফেলে হিরণ্ময়ের কাকাকে কলকাতায় পালিয়ে আসতে হ'ল তখন তাঁরা এসে উঠ্‌লেন—কোথায় বল্‌ তো।"

—"কেন হিরণ্ময়ের বাসায়।"

—"হাঁ, তাঁরা হিরণ্ময়ের বাসায় উঠ্‌লেন আর হিরণ্ময়কে এসে আমাদের পাশের ঘরের পঞ্চম ব্যক্তি হ'তে হ'ল। তাও না হয় বুঝলাম। কিন্তু এখন বেচারী বিয়ে ক'রলে থাকবে কোথায়?"

—"কেন, সেলামী দেবে পাঁচ শ,—দু'খানা ঘর একশ' টাকা ভাড়াতে অনেক রয়েছে।"

—"ব্যাপারটা প্রায় সেরকমই হয়েছে। যে বাড়ীতে এখন ওর কাকারা থাকেন সেই বাড়ির মালিক বলেছেন, হাজার খানেক টাকা পেলে তিনি তেতলায় খানদুয়েক ঘর তুলিয়ে দেবেন—অবিশ্যি সেলামি তিনি নিচ্ছেন না, এক বছরের অগ্রিম ভাড়া হিসেবেই টাকাটা। ছাখো মজাটা, ওর কাকার ত টাকার অভাব নেই, তাঁরই এই হাজার টাকা দেওয়া উচিত ছিল—। তাই বলছি এরকম আহাম্মক ছেলে পরের টাকা মারতে পারে না।"

—"হিরণ্ময়ের শ্বশুরবাড়ির একখানা ঘর ভাড়া পেলে তার সেখানেই গিয়ে থাকা উচিৎ।" নির্মল অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে বল্‌লে।

—"তবে আর মজাটা কি হ'ল, ওর শ্বশুররাও ত রিফিউজি। তাঁরা থাকেন ঢাকুরিয়াতে এক রিফিউজি কলোনীতে।"

—"এক্ষেত্রে বিয়ে না করাই হিরণ্ময়ের ভালো ছিল—আর যদি বিয়েই করতে হয়, শ্বশুরের তিনখানা বাড়ি আর একটিমাত্র মেয়ে থাকা উচিত ছিল।"

—"কাকাই এ বিয়ের সম্বন্ধ ক'রেছেন, মেয়ে পছন্দ করছেন কাকীমা আর অবিলম্বে বিয়ের আদেশ দিয়েছেন হিরণ্ময়ের মা—তিনি নাকি এই বছরে মরবেন এই কথা তাঁর কোষ্ঠিতে লিখছে। ছেলেকে সংসারী না ক'রে মরলে ভবিষ্যতে তাঁদের মুখে জল দেবার কেউ থাকবে না, এই ভেবেই তিনি মরতে ভয় পান।"

—"তাহ'লে ত শুধু ছেলের বিয়ে হ'লেই চলবে না, নাতির মুখ না দেখেই বা তিনি যান কি ক'রে ?"

—"এর সঙ্গে আর একটু অবান্তর কথা যোগ করো—হিরণ্ময়ের খুড়তুতো বোনকে তাঁরা অর্থাৎ—"

—"বুঝেছি হিরণ্ময়ের শালার সঙ্গে—

—"না, শালার সঙ্গে নয়, খুড়শ্বশুরের সঙ্গে হিরণ্ময়ের খুড়তুতো বোনের বিয়ে হচ্ছে।"

—"বাঃ চমৎকার। তাহলে ত হিরণ্ময়কে আরও কিছু ধার করতে হবে, বোনের বিয়ে মাথার ওপর। এতদিনের বোন দাঁড়াচ্ছে গিয়ে খুড়-শাশুড়ী—সোজা কথা নয়।" নির্মল বাঁকা হাসি হেসে সিগারেট ধরালে।

অম্লান প্যান্টের পিছনে পকেট থেকে একটা মোটা চুরুট বার ক'রে বললে—"এখন হিরণ্ময় প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমার সমস্যাটা ভাবো। হিরণ্ময়কে আমি অনেক বুঝিয়ে, বারণ ক'রে, ব্যর্থ হয়েছি। সে বলে, বিয়ে তাকে করতেই হবে। আমি টাকা না দিলেও তাকে অন্য জায়গায় চড়া সুদ দিয়ে টাকা নিতে হবে, আমার কাছে তার মাথা হেঁট করতে লজ্জা নেই কিন্তু অন্যত্র সেই লজ্জা—অগত্যা আমিই ধার করব ঠিক করলাম।"

—"উপরি একমাসের ছুটিই বা কি জন্যে নিলে ? আর ওই বাড়তি এক হাজার টাকাই বা কি জন্যে নেওয়া ?"

অম্লান শূন্য দৃষ্টিতে নির্মলের মুখের দিকে খানিকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"চল্ কোনো রেস্তোরাঁতে যাই—চীনে পাড়ার কোন অচেনা আখড়াতে একটু নিরিবিলি বসি। সেখানে সব কথা বলব।"

অম্লান চৌরঙ্গীর কোন রেস্তোরাঁয় সাধারণতঃ যেতে চায় না, কারণ পরিচিত লোক দু চার জন জুটে যায়, তাদের সামনে মন খুলে কথা বলা চলে না।

পাঁচটা বাজতে তখনও পঁচিশ মিনিট বাকী। নির্মল বললে,—"তুই

মিনিট পাঁচেক ব'স, হাতের কাজটুকু চুকিয়ে দিয়ে যাই, নইলে শালা বড়বাবু খচ্-খচ্ করবে।"

সন্ধ্যে হয় হয়। বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ট্রামে-বাসে, গাড়িতে-মানুষে গিজ্-গিজ্ করছে। দু'পাশের দোকানগুলোর আলো জ্বলেছে। কোনো কোনো দোকানের গ্রামোফোনে হিন্দী ফিল্মের লঘু চালের গান, তার সঙ্গে তরল উচ্ছলতার বাজ্না বাজ্ছে। ঠিক পাশাপাশি দু'জনে একসঙ্গে চল্‌তে পারছে না—অম্লান আর নির্মল। চীনে মেয়েরা খড়ম পায়ে রাস্তা চল্‌ছে, কেউ বা জুতোর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রামের ঠং ঠং, বাসের উদ্ধত হর্ন, রিক্সার ঠুং-ঠুং অসহায় শব্দ।

সরু একটা গলির ভিতরে অনেকখানি চল্‌তে হ'ল। এ পথে শুধু মানুষের ভিড়। অচেনা অপরিচিত পরিবেশ—নির্মল খুব কমই এসেছে এ-রাস্তায়। অম্লানের সঙ্গেই এসেছে সে কয়েকবার। কেমন যেন গা ছম্-ছম্ করে। কেবলই মনে হয় এ পথের প্রত্যেকটি মুখে কেমন যেন ষড়যন্ত্রের ছাপ। অথচ কোনো দিন তেমন কিছুই ঘটে নি। অম্লান চলেছে আগে আগে। অনেক-গুলো বাঁক ঘুরে অবশেষে রেস্তোর্‌াঁয় পৌঁছলো ওরা। এখানে আকাশ সঙ্কীর্ণ —সন্ধ্যা হবার আগেই রাত্রি এসে পড়ে।

ওরা ছাড়া রেস্তোর্‌াঁতে আর যারা আছে তাদের বেশীর ভাগই চীনে অথবা ফিরিঙ্গি, বাঙালী একটিও নেই।

অম্লান বসে পড়ে বল্‌লে—"তারপর এখন কি করা যায় বলো—"

—"এক মাস ছুটি আর এক হাজার টাকা নিয়ে?"

—"আমি সত্যি বল্‌ছি বিয়ে করব ঠিক ক'রেছি।"

—"কেন?"

—"একটা খুব সাংঘাতিক আইডিয়া আমার মাথায় এসেছে। ক'দিন ধরে খবরের কাগজে যে রিফিউজি মেয়েদের খবর বেরুচ্ছে দেখেছ?"

—"ও, ওই যে রিফিউজি মেয়েদের নিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করানোর খবর ত?"

—"I want to marry such a girl!"

—"কিন্তু এ রকম খেয়াল হ'ল কেন?"

—"আমি ঠিক Explain করতে পারছি না। আমার কথা হচ্ছে এই যে, You must live dangerously and vitally."

—"তুমি যেটা করতে চাচ্ছ সেটা খেয়ালখুশির মত শোনাচ্ছে।"

—"খেয়াল খুশি কিছু নয়। আমি তাকে দস্তুর মত বিয়ে করব। আমি তাকে স্ত্রীর মর্যাদাই দেবো।"

—"পারবে?"

—"সেটা পরখ করবার জন্যে একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। আজ রাত নটার সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনের সামনে আমায় যেতে হবে ট্যাক্সি ক'রে—তার পরের কথাটা পরে হবে। অবিশ্যি আমি যে বিয়ে করতে চাই এ কথা এই তুই ছাড়া আর কারুর কাছে বলি নি।"

—"ত্যাখো অম্লান, বাজারের বেশ্যাদের সঙ্গে চ্যাংড়ামী করা আর এইসব মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহার করা এক নয়। এরা হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয় বাপ-মা ভাই-বোন সকলের মুখ চেয়ে অন্য রাস্তা দেখতে না পেয়ে এই পথে নামছে—"

অম্লান একবার রঙীন মদের গ্লাসের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আস্তে বললে—"আদর্শবাদের বেলপাতা আমার মাথায় চড়াতে চেষ্টা করিস না নিমু। Any way, আমি একলা থাকব না, তুই আমার সঙ্গে যাবি।"

—"আমি?"

—"হাঁ, আমি হয়ত ভুল করতে পারি, দুজনের চোখে যাচাই হওয়া ভালো—"

—"না, না, আমায় বাদ দাও ভাই—"

—"Silly goat! বাজারের রুটি বাপ-বেটায় খায়। তা তুই ত আমার দোস্ত। আমি কোনো কথা শুনছি না—বেশ পেট ভরে খেয়ে নে। Mind you, তোমাকে বেশি মদ খেতে দিচ্ছি না, একটুতেই বড্ড বেসামাল হয়ে পড়িস তুই।"

—"বাড়িতে মা ভাববেন—একটা খবর দিতে পারলে হ'ত।"

—"তাতে আর কাজ নেই। বিধবা মায়ের আর কাজ কী, না হয় একটু বসে বসে দুশ্চিন্তাই করবেন। Try to live dangerously!"

শিয়ালদহ ষ্টেশনের চারিদিক ঘিরে একটা প্রচণ্ড কলরব। লোকে-লোকে পীচের পথ থেকে শুরু ক'রে প্লাটফর্মের মেঝে পর্যন্ত ছেয়ে গেছে—কোথাও মাটি দেখবার উপায় নেই, দু-হাত, চার-হাত অন্তর লাল শালু ফেস্টুন—কলকাতার অসংখ্য সেবাসমিতির তালিকা এখান থেকেই পাওয়া যায় কাঁটা তার আর নারকেলের দড়ি দিয়ে অজস্র সীমানার গণ্ডী টানা রয়েছে—এতটুকু পা-বাড়াবার ঠাঁই খুঁজে পাওয়া যায় না। রাত্রির চিহ্ন অন্তর্হিত হয়েছে কেবলমাত্র আলোগুলো জ্বলছে, এছাড়া এখানকার মানুষগুলোর হাবভাবে মনে হয় এদের জীবনে ঘুম নেই। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার চরম পাথার। অম্লান চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লে, চুরুটটার শান্ত গভীর একটি দীর্ঘ টান দিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ল।

মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে থাকবার পরই একটি লোক এগিয়ে এসে বল্‌ল—"চলুন, ট্যাক্সি ঠিক আছে ত?"

ট্রাউজারের পকেটে হাত চালিয়ে দিয়ে অম্লান ঘাড় নেড়ে বলল—"কিন্তু তোমার মালিনী কই হে?"

—"আছে, আছে। আপনি চলুন ত—"

ট্যাক্সির ভেতর নির্মল অন্ধকারে এক কোণে বসে ছিল। অম্লানকে একা ফিরতে দেখে বল্‌লে—"কেমন, হয়েছে ত? রিফিউজি মেয়ে ওর জন্যে ছড়াছড়ি যাচ্ছে। আরে বাপু তোর কপালে ওই তেলকলের পুঁটিই নাচ্‌ছে।"

কথাটা শেষ ক'রেই নির্মল অপ্রতিভ হয়ে গেল। অম্লানের পেছনে একটা লোকের সঙ্গে যে মেয়েটি আসছিল অম্লান ট্যাক্সির দরজা খুলে দিতেই সে মেয়েটি গাড়ীর মধ্যে এসে বসল। মেয়েটির নিশ্বাসের হাওয়া নির্মলের গায়ে এসে লাগছে। অম্লান উঠে বসতেই মেয়েটি সরে বসতে গিয়ে নির্মলের গায়ের ওপর এসে পড়ল। মেয়েটির সঙ্গের লোকটি গাড়িতে উঠ্‌ল না, ট্যাক্সির ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—"বড় বাবু একটা কথা বল্‌ছি—"

অম্লান বল্‌লে—"কী হ'ল আবার?"

—"আজ্ঞে আপনাকে কি আর বেশি বলতে হবে! হিসেবের চেয়ে দু'পা বেশী হচ্ছে কিনা—তাই আরও দু'হাত ভর্তি চাই।"

—"কিন্তু বাপু মাছের মুড়ো তো একটাই পাতে পড়ল, আমরা ভাগাভাগি ক'রে খেলে আপত্তি কি—"

নির্মলের মনটা কুণ্ঠায় বিরক্তিতে শির্ শির্ করতে থাকে। যে মেয়েটিকে নিয়ে ওরা দু'জনে এইভাবে কথা বলছে সে মেয়েটির চোখে এরা কত ছোট প্রতিপন্ন হ'ল। নির্মলের মনে হচ্ছে মেয়েটি ভয়ে কাঁপছে, তার কম্পনের ছোঁয়া লাগছে নির্মলের গায়ে। তার ইচ্ছে করছে এই দুটো লোকের মাথা ঠুকে গলা ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে। অম্লানের শান্ত অবিচল ভাবভঙ্গীর মধ্যে নির্মল দেখতে পাচ্ছে একটা নৃশংস কুকুরের নিষ্ঠুর স্থৈর্য। ওদের কথাগুলো কানে আসছে কিন্তু মনে পৌঁচচ্ছে না। নির্মল সাগ্রহে অনুভব করছে মেয়েটির কম্পিত দেহের শিহরণ স্পর্শ। মেয়েটি কেমন যেন গুটিয়ে রয়েছে।

ট্যাক্সি ছাড়ল। অম্লান হেসে উঠ্‌ল—"কি রে নিমে, তুই যে একেবারে সেঁটি হয়ে গেলি!"

—"ধাঃ, সব সময় চ্যাংড়ামি ভালো লাগে না।"

অম্লান এবারে মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, তাতে সে আরও যেন সরে এসে নির্মলের গা-ঘেঁষে বসল। নির্মলের মনে হ'ল মেয়েটি ঠিক তার কাছে আশ্রয় চাইছে। আহা বেচারী—এই কলকাতা শহরের দস্তুর কিছুই জানে না, কি জানি কত সন্ধ্যায় পল্লীর তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছে, কি নিশ্চিন্ত জীবন অতিবাহন ক'রেছে—আর আজ?

নির্মল আস্তে আস্তে ওর পিঠের ওপর হাত রেখে বললে—"তোমার নাম কি ভাই?"

অস্পষ্ট—প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটি—"শতদল—"

অম্লান সরে এসে ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার চেষ্টা করে—"শতদল, বাঃ, শতদল তোমাদের পদবী কি?"

—"শতদল রায়—কিন্তু আমার নাম, পদবী এসব শুনতে চাচ্ছেন কেন?"

বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর আবার গাঢ় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল—"আমার পদবী কিছু নেই, আমি, আমি"—বলতে বলতে মেয়েটি যেন ভেঙে পড়ল।

অম্লান সান্ত্বনা দিতে চাইলে—"ছিঃ কেঁদো না, তোমার কি দোষ। তুমি আর কী-ই বা করতে পারতে?"

—"আমার মা, আমার বুড়ো ঠাকুরমা, তিন বোন, দুই ছোট ভাই—এদের নিয়ে কি হবে?"

—"তুমি ত তাদের মুখ চেয়েই যে পথটুকু খোলা আছে সেই পথে—"

অম্লানের কথা শেষ হবার আগেই মেয়েটি অধীরভাবে বলে উঠ্‌ল—"তাদের জন্যে, আজই এই প্রথম আমি লুকিয়ে চলে এসেছি। জানি না ভাগ্যে কি আছে। আপনারা আমায় ছেড়ে দিন—দোহাই।"

নির্মল ড্রাইভারকে বললে—"গাড়ি ঘোরাও—স্টেশনে চলো।"

অম্লান বললে—"না, না।" তার কণ্ঠস্বরে কোনো সংশয় নেই। সে বললে—"শোনো শতদল, তোমার জন্যে আমাদের টাকা খরচ করতে হয়েছে। শেষে আমার বন্ধুটির জন্যেও ওই দালাল দশ টাকা আরো আদায় করেছে। হোটেলের ঘরভাড়া, ট্যাক্সি—সব মিলিয়ে সত্তরের ওপর খরচ।"

—"আপনার আছে তাই করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের জমিজেরাৎ গরুবাছুর সব ফেলে দিয়ে যে ইজ্জত বাঁচাতে আপনাদের কাছে এলাম—সেই ইজ্জতের দাম এই—"

অম্লান হেসে জবাব দিল—"বাঃ, তুমি ত বেশ কথা বলতে পারো।"

নির্মল বললে—"আঃ কি হচ্ছে অম্লান!"

শতদল বললে—"আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

সেই চীনেপাড়ার গলিতে গাড়ি এসে ঢুকল।

ঘরে ঢুকেই শতদল দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সামনের সোফাতে। কান্নার বেগে ওর তনুদেহ ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। নির্মল ডাকলে—"শতদল, শোনো—"

অম্লান বিরক্তিভরে বলে উঠ্‌ল—"খুকীপনা ক'র না শতদল।"

শতদল চোখ মুছে সোজা হয়ে বসল—"ও হ্যাঁ, আপনাদের সত্তর টাকার ওপর খরচ হয়েছে। ঠিক—"

নির্মল করুণার্দ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"আচ্ছা শতদল, তুমি কাউকে ভালো বাসো?"

—"হ্যাঁ—"

—"কাকে?"

—"আমি তাকে এখনও দেখি নি।"

—"দ্যাখো নি অথচ ভালোবাসো?"

—"একমাত্র সে-ই আমাকে বাঁচাতে পারে, শান্তি দিতে পারে, সেইজন্যেই তাকে ভালবাসি।

—"কে সে?"

—"আমার যম।"

অম্লান বললে—"তুমি ফিল্মে নেমে যাও, বেশ মোটা রোজগার হবে।"

—"কিন্তু আমার মত কুচ্ছিত মেয়েকে নেবে না তারা।"

—"কুচ্ছিত! কুচ্ছিত!"...বলতে বলতে অম্লানের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এল। তারপর সে বললে—"নাঃ, যৌবনটা তোমার খুব কড়া আছে।...আচ্ছা তুমি গান গাইতে জানো?"

—"হ্যাঁ, একটু একটু।"

—"কি গান জানো?"

—"রবিবাবুর গান, নিধুবাবুর গান।" বলতে বলতে শতদল একবার অম্লানের দিকে, একবার নির্মলের দিকে তাকাল।

নির্মল একবার অম্লানের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শতদলকে বললে, —"আচ্ছা শতদল, তুমি বিয়ে করবে?"

—"আমাকে আবার কে বিয়ে করবে?"

—"ধরো যদি কেউ করতে চায়, তাহলে? আমার এই বন্ধুটি মেয়ে খুঁজছেন। রিফিউজি মেয়ে—জাতকুলের জন্য আটকাবে না।"

শতদলের চোখের চাহনীতে যেন মদিরতার পাত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

অম্লান এসে বসল শতদলের সোফার চওড়া হাতলের উপর, বললে—"আচ্ছা সত্যি বলো, তুমি কদ্দিন রোজগার করছ।"

শতদল ধর্ষিতা কমিনীর মত উঠে দাঁড়িয়ে বললে—"আপনারা ত ভদ্রলোকের ছেলে, তবে কেন সন্দ করেন। রোজগার কি আর সাধ করে করতে এসিচি।"

—"হ্যাঁ 'সন্দ' করি বই কি, মিথ্যে কথা বললে বুঝতে পারব না এত বোকা নই।"

নির্মল বললে—"এই অমল কি হ'ল, অমন ইয়ে করছিস কেন?"

অম্লান তার কথা কানেই তুললে না—"তোমার বস্তীর কি ঠিকানা বল তো মাইরি।"

—"আব্‌নি একটু ভালো ক'রে কথা বলুন। ও কী কথা, বস্তী! কেন আমি কি খান্‌কী নাকি। আমি থাকি শ্যালদায়—আমার মা, ঠাকুরমা, তিন বোন, দুই ভাই। বরিশালে আমাদের বাড়ি। কী কাণ্ড ক'রে যে পালিয়ে এসিচি তা আপনারা কি বুঝবেন। উঃ সে কি আগুন। এখানে এসে খেতে পাইনে, লঙ্গরের খাওয়া মুখে দিলে বমি উঠে আসে, আমাদের বুধি গাইও হয়ত ওয়াক তুলত সে খাবার চোখে দেখ্‌লে। আর দায়ে পড়ে পথে বেরিয়েছি—তাই ব'লে অপমান করবেন বস্তীর সঙ্গে—"

অম্লান হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল। তার মুক্ত কণ্ঠের উদাত্ত হাসিতে পুরনো ঘরখানার ছাদ পর্যন্ত চমকে উঠ্‌ল—এ কী হাসি!

হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কঠিন কণ্ঠে বললে সে—"আব্‌নি, শ্যালদা ভদ্দরনোক—এসব যে বাবা শুনে শুনে কান পচে গেছে। মাইরি বলছি শতদল, তোমাকে রামবাগানের গলির কাছাকাছি কোথাও দেখেছি। বরিশাল কোথায় জানো?"

—"হ্যাঁ জানি। তিন দিনের পথ—তা ছাড়া আমরা ত তিনদিনে আসতে পারি নি। কতবার আমাদের ষ্টীমার আটক করেছে।"

"—বাঃ ঠিক বলছো দেখছি। তোমাদের দেশে বুঝি শ্যালদা 'বলে, নিধুবাবুর গান শিখ্‌লে কোথায়?"

—"আমি অতশত জানিনে। যে জন্যে টাকা খেয়েছি সেই কাজ চুকিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন, আমার বড্ড মাথা ধরেছে।"

হঠাৎ মেয়েটির মুখ শুকিয়ে গেছে—যেন চোর ধরা পড়েছে। ঠিক হাতেনাতে ধরা পড়লে এইরকম বিষণ্ণ বিব্রত নিরুপায় চেহারাই মানুষের হয়। মেয়েটি আর কোনো পথ না পেয়ে কাঁদতে শুরু করল।

অম্লান পিছন দিক থেকে শতদলের দু'হাত ধরে দাঁড় করিয়ে, খুব জোরে একটা ঝাঁকানী দিয়ে বল্লে—"ন্যাকামী রাখো। আগে বলো তুমি এইভাবে বোকা বানাতে চাচ্ছিলে কেন? সোনাগাছীতে পাঁচটাকায় যাদের ছড়াছড়ি তাদের জন্যে আমি সত্তর টাকা খসাবার ছেলে নই। বলো, বলো—"

নির্মল অবাক হয়ে গেল, মেয়েটির কাণ্ড দেখে—মেয়েটির চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠেছে, দৃপ্ত কণ্ঠে ও জবাব দিল—"কেন করব না। তোমরাই ত আমাদের এ সব শিখিয়েছ। তোমরা কেউ আর আমাদের গলি মাড়াও না, নোলা দিয়ে জল গড়ায়—রিফিউজি মেয়ে চাই। ভদ্দরনোকের মেয়েদের হলে বাবুদের আর মন ওঠে না। আঃ কি আমার দয়া—যারা মোচলমানের হাত থেকে বেঁচে এখানে এসে পাখীর মত তোমাদের আনাচে-কানাচে আশ্রয় নিচ্ছে তাদের কচমচিয়ে খাবে। কী মজা! মোচলমানের হাত থেকে বেঁচেছে ব'লে ভদ্দরনোকের হাত থেকে তারা পার পাবে না।...কিন্তু সে যাক গে, তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, তাদের ধর্ম তারা বুঝুক। এখন আমাদের যে না খেয়ে মরতে হয়। মাইরি এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি পাঁচদিন কেউ চৌকাঠ পেরিয়ে আমার ঘরে ঢোকে নি। একটি কানাকড়ি কপালে জোটে নি। আমারই কি পথে বেরুতে ভরসা হয়েছিল? ওই মুখপোড়া নলিত বাবু বল্লে—। আর বলবে কি, এখন ত নিজেই দেখ্‌চি। আটটাকার জায়গায় বিশ-তিরিশ টাকা, গাড়ী চড়া। আমাদের পাড়ার সব মেয়েই ত দালালদাতে আসে আজকাল—। তোমার মত এমন ফঁচেলের পাল্লায় পড়ব তা কে জানত। উঃ তুমি যেন কেমনধারা মানুষ, নাগর।"

অম্লান বাঁকা হাসি হেসে বল্লে—"ভারি রস না!"

শতদল খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল—"মাইরী, রাগ করেছ নাগর? আমার যৌবনবাগানে বস'।"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে অম্লান শতদলের গালে সজোরে চড় বসিয়ে দিল। ওর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

নির্মল যদি চট্ ক'রে অম্লানের হাত চেপে না ধরত তাহলে হয়ত সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যেত। নির্মলের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে অম্লান বল্‌লে—"ছাড়, আর ভালো লাগে না এই বাজারের বারোয়ারী রুটি। অন্যদিন হ'লে আমি কিছু বল্‌তাম না। কিন্তু আশার গুড়ে বালি দিল এমনি ক'রে! আমি চাই শান্তি। মাইরী নির্মল, আজ আমার বিরাট একটা আশায় ছাই পড়ল। ভেবেছিলাম, সত্যিই বিয়ে করব, রিফিউজি একটি মেয়েকে বিয়ে করে, তাদের পরিবারের সঙ্গে মিশে যাবো, কিন্তু দুনিয়াজোড়া জোচ্চুরীর জাল ফেলে বসে আছে এই ইয়েরা।"

শতদল এতক্ষণে চড়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে। কিন্তু ওর গালের ওপর অম্লানের তিনটি আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে। শতদল আস্তে আস্তে বল্‌লে—"কথায় বলে পেটে খেলে পিঠে সয়! কিন্তু তুমি নাগর আমার গালে মেরে বসলে, আমি এ মুখ দেখাবো কি ক'রে? খেসারত দিতে হবে কিন্তু—। একটু আদর করে পাঁচটা টাকা বেশি দিয়ো মাইরি বল্‌ছি বড্ড লেগেছে।"

অম্লান গর্জে উঠল—"চোপরাও কুত্তা!"

নির্মলের দিকে তাকিয়ে অম্লান বল্‌লে—"যা ত একে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আয়! আর ব'লে দে ফিরে এখানে এসে ট্যাক্সি ভাড়া নিতে।"

এবারে শতদলের মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল—"না, না, আমাকে একা ট্যাক্সিআলার সঙ্গে ছেড়ে দিয়ো না। শেষে ট্যাক্সিআলা—"

অম্লান হো-হো ক'রে হেসে উঠল—"ভালোই ত, আরও দু-পাঁচ টাকা মিলে যাবে। গাড়ীও চড়া হয়ে যাবে।"

—"না-না সে পারব না। দোহাই তোমাদের পায়ে পড়ি।"

শতদলের অনুনয়ে অম্লানের মনটা একটু নরম হ'ল, অবশেষে ওরা তিন জনেই হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

নির্মল বল্লে—"হ'ল ত রিফিউজি মেয়ের সঙ্গে আশ্‌নাই।"

অম্লান চুপ ক'রে ছিল।

শতদল বল্লে—"হাজার হোক তারা এ লাইনে নতুন, আমাদের সঙ্গে পারবে কেন। নাগর আমার সোনার পাথরবাটি খুঁজে মরছে স্তালদাতে। ওরা খেতে পায় না, তার ওপর ভদ্দরসদ্দর লোক, মুখ্‌চোরা। আর আমাদের হচ্ছে রেসের ঘোড়া—খাইয়ে দাইয়ে সব সময়ে তোয়াজে রাখি শরীরটা। মাথা ঠাণ্ডা করলে নাগর আমার ভুল বুঝতে পারবে, কি বলো গো।"

অম্লান কঠিন কণ্ঠে বল্লে—"এবারে কিন্তু গোরুর চাম্‌ড়া দিয়ে গালে সেলামী দেবো।"

শতদল বল্লে—"এই চুপ করছি। কিন্তু আর স্তালদায় গিয়ে কাজ কি—আমাকে এই গিরিবাবুর গলি পেরিয়ে বাঁয়ে নামিয়ে দাও। এই কাছেই আমার বাড়ি।"

গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময় শতদল বল্লে—"রাগ পড়লে এসো কিন্তু, পথ চেয়ে থাকব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অম্লান বল্লে—"পোড়া কপালে বিয়ে বুঝি হ'ল না আমার। শেষে এই একমাসের ছুটিটাই মাটি হয়ে যাবে নির্মল!"

—"সেই সঙ্গে হাজারটি টাকাও ত ফুঁকে দিবি?" নির্মল চিন্তিত ভাবে বল্লে।

—"নাঃ, ভালো করে খুঁজে, দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করবই, তুই দেখিস!"

নিরঞ্জন রীতিমত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠেই বলে—হ্যাঁ, তোমার চোখ আছে ভাই মলিনা,—তারিফ করতে আমি বাধ্য। এতদিন এই মেয়ে দেখার কথা কেন যে বল্‌তে তোমার সঙ্কোচ হচ্ছিল?

নিরঞ্জন যতখানি উৎসাহিত ভাবে কথা বলছিল, মলিনা ঠিক ততখানি নির্লিপ্ততা সহকারেই বলে—আহা কী এমন মেয়ে, যে দেখেই আঁকুপাঁকু করতে হবে? থাকবার মধ্যে ত যা ওই গায়ের রংটা 'কটা' আর চোখ দুটো মন্দের ভালো। আর আছে কি?

—আর তোমার নিরুদাই বা কী এমন রাজপুত্তুর? একবার ভেবে দ্যাখো, আমার বয়স হয়েছে, তাছাড়া তুমি যা-ই বলো বাপু মেয়েটি নিন্দের ত নয়। জানি না, তোমাদের কষ্টিপাথরে ওর কতখানি খাদ বাদ যাবে—

অধীর আগ্রহে নিরঞ্জন নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মলিনার নিষ্প্রভ মুখের দিকে তাকায়। নিরঞ্জনের মনে রঙের রেশ লেগেছে। কতকাল পরে যেন কোন দূর যুগান্তের পার থেকে বিস্মৃতির মাথা ছাড়িয়ে এগিয়ে আসে আলোর আভা। আলোয় আলোকময় হয়ে ওঠে নিরঞ্জনের একঘেয়ে মনের পট-ভূমি।

…এমনি একদিন রঙ লেগেছিল তার তরুণ মনের আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে!

মলিনা তার ভাবতরঙ্গে ছেদ টেনে দিয়ে বলে—আহা তোমার যে আর খুশি ধরছে না! আগে ওঁকে আপিস থেকে আসতেই দাও!

মলিনার বিদ্রূপে নিরঞ্জন অপ্রতিভ হয়, কিন্তু উৎসাহ তার কিছুমাত্র দমে না, সে বলে—না, না তা আমি মোটেই বলছি না। প্রথমে তুমি যে রকমভাবে বললে, দেখতে এই চলনসই, মোটামুটি রকমের মেয়ে,—সে কথা শুনে একটু দমে গিয়াছিলাম ভাই, কারণ, বাংলা দেশে মেয়ে দেখবার আগে যে মেয়েকে অপূর্ব সুন্দরী বলা হয় তারাই চলনসই—আর যাদের চলনসই বলে চালাবার চেষ্টা করি আমরা, তারা নিঃসন্দেহে অচল। কিন্তু তোমার ওপর বরাবরই আস্থা আছে, সেই ভরসায় গাড়ী ভাড়া খরচ ক'রে

দেখতে এলুম। চলনসই শুনে যদি না আসতুম তাহলে কিন্তু রীতিমত ঠকতে হত, কি বলো? তোমার কর্তারও দেখলাম বেশ পছন্দ।

ঠোঁট উল্টে মলিনা বললে—অল্প বয়সের ছুঁড়ি দেখলেই ত বেশিদিন বিয়ে হওয়া পুরুষেরা গ'লে কাদার তাল হ'য়ে যায়। আমার কর্তার কথা বাদ দাও নিরুদা, তার ত পছন্দের নমুনা আমি, কাজেই ওর দৌড় জানা আছে। কিন্তু তোমাকে যে শিল্পী ব'লে জানি।

নিরঞ্জন কয়েক মুহূর্ত যেন অন্যমনস্ক হয়ে কী একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে। তারপর আস্তেআস্তে বলে—ভুলে গেছ না কি, একদিন আমিও তোমায় পেতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু সে তো আমার দুর্গতি দেখে দয়া হয়েছিল তোমার। সেখানে আমার মূল্য যাচাইএর প্রশ্ন ছিল না। তোমার উদারতার পরিচয় দেবার আগ্রহই বড় ছিল। বাবার অত্যাচার সইতে না পেরে চাকরী করতে যাচ্ছি দেখেই না তুমি বড় মুখ করে বললে—কই, তার আগে ত ওকথা শুনতে পাইনি! ওটা পছন্দর কথা নয়, দুর্গতের প্রতি করুণা।

—তা বটে, পাছে আমার একটা খ্যাতি হ'য়ে যায়—সেই জন্যেই বুঝি আমায় ছেড়ে অন্যত্র মন বাঁধা দিয়ে ফেল্লে—পরম মূল্যটাও আমায় হ'ল। কি বলো?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মলিনা বলে—কিন্তু পরম মূল্যটা শুধ্‌তে হচ্ছে তিলে তিলে। তুমি আর ব'ল না নিরুদা! সেদিন তোমায় বুঝতে পারি নি, সেকথা চিরজীবন ধ'রে আমার চেয়ে আর কে বেশি জানে। এখন যদি তোমার বিয়ে দিয়ে সুখী করতে পারি তাহলে প্রায়শ্চিত্ত কিছুটা হবে।

—তাহলেই দেখছ ত, তোমায় মহৎ হবার সুযোগ দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, তাহলে সামনে যখন পৌষমাস পড়ে যাচ্ছে তখন এ মাসেই একটা দিন দেখতে হয়।

—দাঁড়াও, তোমার যে আর তর' সয় না। বিয়ে অমনি মুখের কথা বল্লেই হ'ল? আগে ভালো ক'রে ওদের কুলের খবর নেওয়া'থোয়া হোক। তারপর—

ব'লে ব্যস্ত হয়ে মলিনা রান্না ঘরে কি একটা কাজে ছুটে যায়। নিরঞ্জন এ ঘরের আসবাবপত্র এটা ওটা নাড়াচাড়া ক'রে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। কারখানারই দেড়খানি ঘরের কোয়ার্টার। ছোট্ট একটুখানি উঠান, বারান্দাও একফালি রয়েছে। এই অপরিসর জায়গায় এরা যেন নিবিড় শান্তির নীড় রচনা ক'রে বেশ আছে—এই মুহূর্তে নিরঞ্জনের এমনিতর একটি সাংসারিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে কল্পনা করতে ভারি ভালো লাগে।

রান্না ঘরে মলিনার ভাবরাজ্যে অস্বাভাবিক বিপর্যয়। আধহাত পিঁড়িটার ওপর ব'সে যেন ওর হাত-পায়ের কাঁপুনী কতকটা কমে। নিরঞ্জনের এই অধৈর্য হওয়া, এই কাঙালপনা ও কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।··· তবে কি এই লোলুপতা বুকে নিয়ে মলিনার ওপর অভিমান ক'রে কৌমার্য বজায় রেখেছিল নিরঞ্জন!···

কি একটা কথা মনে হতেই নিরঞ্জন রান্না ঘরের দোরের সামনে এসে দরজাটা ধ'রে ঝুঁকে প'ড়ে বললে—জানো মলিনা! এমন মিষ্টি হাসে নিরুপমা! আমি যখন জিজ্ঞেস করলুম, মাংসের দোপেঁয়াজী রান্না করতে পারেন? তার জবাবে হেসে বললে, আমাদের বাড়ীতে ত মাংস ঢোকে না ঠাকুমার জন্যে, তবে শিখিয়ে দিলে তখন খুব পারব!—ভারি সুন্দর সাজানো ওর দাঁতের পাঁতি!

গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে মলিনা বলে—বলো কি? কী বেহায়াপনা? মুখের ওপর বললে তোমায়, শিখিয়ে নেবেন! আচ্ছা ইয়ে ত! মেয়ে দেখতে গেছ অচেনা পুরুষ মানুষ, তোমায় কিনা বললে, শিখিয়ে নেবেন না হয়—এঁ্যা!

নিরঞ্জন প্রতিবাদ ক'রে বলে—না সে কথা ত বলে নি, বললে শিখিয়ে দিলে খুব পারব!

—ওই হ'ল, ও একই কথা।

কতকটা হতাশ হয়েই নিরঞ্জন বলে—সে কি আর অতশত ভেবে বলেছে?

—ছাখো নিরুদা, তুমি ত দেখছি বৌ না হতেই তার দিকে টেনে টেনে কথা বলতে সুরু করলে!

ব'লে ব্যস্ত হয়ে মলিনা মুখ ঘুরিয়ে বসল।

নিরঞ্জন আর কথা না বাড়িয়ে ঘরে এসে বসল। বিছানায় মলিনার কনিষ্ঠা কন্যাটি সদ্য ঘুম ভেঙ্গে উঠে সরবে সেই বার্তা প্রচারের আয়োজন করতেই নিরঞ্জন তাকে কোলে তুলে নিয়ে নাচাতে লাগল—এটি মলিনার চতুর্থ সন্তান।

রান্নাঘরে ডালে ফোড়ন দেওয়ার শব্দের রেশটুকু কাটতে না কাটতে মলিনা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকল। এবং কোন রকম ভূমিকা না করেই বললে—আসলে যা শুনতে পাই তাতে মেয়েটি খুব সুবিধের নয়—সেই জন্যেই ছ্যাখো নি, গোড়া থেকে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। কিন্তু তোমাদের ইয়ের তাগাদার চোটেই না শেষ কালে তোমায় লিখলুম।

নিরঞ্জনের বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বোধ হয় বেদনাও কিছু ফুটে উঠেছিল, সে বললে—কই, সে কথা ত আগে বলো নি আমায়?

—আগে থেকেই কেন কেচ্ছা করব? না পছন্দ হ'লে ত চুকেই যেতো। তোমার যখন এত পছন্দ তখন খুলে না ব'লে আর উপায়ই বা কি?

—সুবিধের নয় মানে কি?

—নাও, কচি খোকা এলেন উনি। ন্যাকামী দেখলে গা জ্বলে যায়। ওই মিষ্টি হাসি দিয়ে অনেককে খেলিয়ে বেড়ান এটুকুও বুঝতে দেরি হয়। নিজেকে দিয়েই বোঝো—

—কিন্তু ওদের বাড়ীর সবাইকে ত বেশ ভালো বলেই মনে হ'ল।

—ছ্যাখো নিরুদা, ওই জন্যেই তুমি আজও ছেলে মানুষ রয়ে গেলে। ওসব তুমি বোঝো না। যাক্, আমি বলছি, আমার দায়িত্ব আমি করছি—কারণ তুমি যখন আমার উপর সব ভার ছেড়ে দিয়েছ তখন তোমায় খোলাখুলি জানাতে আমি বাধ্য—কানাঘুষো যা শুনি তাতে মনে হয় ও মেয়ের স্বভাব চরিত্র যেন ঠিক ভাল-বলা যায় না।

নিরঞ্জনকে চিত্রার্পিতের মত নিশ্চল, নির্বাক দেখে মলিনার ওষ্ঠে মৃদু হাসি রেখাঙ্কিত হয়ে যায়, ও বললে—অত মুষড়ে প'ড় না নিরুদা, আমি যখন ভার নিয়েছি তখন এর চেয়ে ঢের সুন্দরী মেয়ে খুঁজে দিচ্ছি। তা বলে জেনে-শুনে ও আর—

কথাটা সম্পূর্ণ শেষ হবার আগেই ও ঘর থেকে উনুনে ডাল উথ্‌লে পড়ার গন্ধ পেয়ে মলিনা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে নিরঞ্জনকে জুতো পরতে দেখে মলিনা প্রশ্ন করে—এই অবেলায় এখন কোথায় বেরুনো হচ্ছে শুনি!

—সিগারেট একদম ফুরিয়ে গেছে, চট করে ঘুরে আসছি।

—তার কি দরকার, একটু পরেই ত গোয়ালাটা দুধ দিতে আসবে। তাকে দিয়ে আনিয়ে দেবো'খন, তুমি নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করো। সারা রাত গাড়ির ধকল গিয়েছে। এই তেতপ্পর রোদে আর বেরিয়ো না।

—এই ত পাঁচ মিনিটের পথ। কিন্তু এত বেলায় তোমার গোয়ালা আসে ত ছেলেপুলের সকালে দুধের কি ব্যবস্থা?

—ওপার থেকে আসতে আসতে বেলা হয়ে যায়। সকালে এখানকার জোলো দুধ আর কিনি না। বাচ্চাদের সব মিল্ক পাউডার গুলে খাওয়াই। এই এক জ্বালা হয়েছে।

পথে পড়ে' খানিক দূর এগিয়ে এসে নিরঞ্জন একটা গাছের নীচে ছায়ায় বসে সন্তর্পণে প্যাকেট ভেঙে একটি সিগারেট ধরায়। এ ভাবে বিয়েটা ভেঙে যাওয়ায় তার মন যৎপরোনাস্তি বিমর্ষ। বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে অনেক প্রস্তুতি মনে মনে গড়ে তুলেছিল। এক নিমেষে ফুটো ফানুসের মত চুপ্‌সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আশার সেই স্বপ্ন। মলিনার ঘর খানা যেন অত্যন্ত ছোট। ওখানে বসে থাকতেও কষ্ট হয়। তা ছাড়া মলিনার সামনে তার হতাশার চেহারাটা পাছে অত্যন্ত সুপ্রকট হয়ে ধরা পড়ে যায় এ আশঙ্কাটাও কম নয়।

নিরঞ্জন জানে মলিনা তাকে কতখানি ভালোবাসে। দীর্ঘদিন ধ'রে নিরঞ্জন ওর সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছে—কিন্তু শেষে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছে নিরঞ্জন। মলিনার নিরন্তর অকৃত্রিম আকর্ষণ নিরঞ্জনের বিরূপ মনকে ফিরিয়েছে। সত্যি যদি মলিনার প্রীতিটা নিখাদ না হবে তাহলে বিয়ের পরও বার বার সে নিরঞ্জনকে খুঁজবে কেন? এই খোঁজার জন্য মলিনাকে লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে স্বামীর কাছে। তবু, সে সব অগ্রাহ্য ক'রে মলিনা তাকে সংসারী করবার জন্য ব্যস্ত।...সেই জন্যই বোধ হয় নিরুপমাকে মলিনার মনে ধরেনি। ও চায় একটি

নিখুঁত রূপসী মেয়ে। তাই বোধ হয় পাত্রীর কোনরকম অসঙ্গতি সইতে পারছে না। কিন্তু নিরঞ্জন নিজে জানে পাত্রের বাজারে সে বাসি সিঙ্গাড়ার মতই অকিঞ্চিৎকর, তাছাড়া বিচার করলে তার নিজের যোগ্যতা অনেক দিক দিয়েই নেই।

মলিনার রান্নায় মন নেই। অথচ বহুদিন আগে থেকে তার বাসনা নিরঞ্জনকে ভালোমন্দ রান্না ক'রে খাওয়াবে। সেই যে মেয়ে দেখে এসে নিরঞ্জন গদগদ হয়ে গলে পড়ল সেইক্ষণ থেকেই ওর মনটা কেমনধারা হয়ে গেছে। তারপর যখন শুনলে যে, নিরুপমার ভারি মিষ্টি হাসি, মিষ্টি হাসি হেসে বলেছে দোপেঁয়াজি শিখিয়ে দিলেই ও রাঁধতে পারবে—তখন যে কী হয়ে গেল, সারা পৃথিবীতে কী এক এলোমেলো বিশৃঙ্খলা দেখা গেল যেন।...

মলিনার মনে একটু সংশয় জাগে,—সত্যি এভাবে একটি কুমারী মেয়ের নামে কলঙ্ক রটনা ক'রে খুব অন্যায় ক'রেছে সে! কিন্তু পরমুহূর্তে তার মধ্যে থেকে কে যেন প্রতিবাদ ক'রে উঠল—না, না, ঠিকই হয়েছে। এতে আবার অন্যায় কি থাকতে পারে? যে মেয়ে অপরিচিত পুরুষের সামনে নির্লজ্জের মত ওই সব গায়ে-পড়া কথা কইতে পারে তারা যে কী ধরনের মেয়ে তা সবাই অনুমান করতে পারে।...মলিনা নিজের মনেই নিজের সঙ্গে বাদানুবাদ করে—সত্যি নিরুদা বিবাহের সকল দায়িত্ব ওর ওপরে ছেড়ে দিয়েছে, সেখানে এ মেয়েকে জেনে শুনে ঘরে আনা চলে না। ওর স্বভাবটা এক রকম জানা শোনা বই কি, এই ত নিরুদার মত পুরুষ মানুষও ওই মেয়েটির হাসি দেখে গলে গেলেন, এর আগে ওই মেয়েটি এর চেয়ে মর্মান্তিক হাসি হেসে আরও কারুর সর্বনাশ যে করেনি, তা কে জানে?

মলিনা হলপ ক'রে বলতে পারে, যে মেয়ের ওইরকম আলগাশ্রী, ওই-রকম টানা টানা চোখ, মুখশ্রী বেশ ভালোই—অন্ততঃ পুরুষের দৃষ্টিতে, যার ওই রকম আগুনের মত জ্বলন্ত রং এবং কাঁচা বয়সের বিকচ যৌবন সে কি কখনও হাত-পা গুটিয়ে ব'সে ছিল এতদিন? মলিনা মেয়ে হয়ে নিশ্চয়ই জানে নিরুপমার সম্বন্ধে তার অনুমান শুধুই অনুমান মাত্র নয়—তা নির্ভুল সত্য।

নিরুদার বিয়ে সে দেবেই। সে নিরুদাকে সুখী দেখে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে মরবে। হ্যাঁ, নিরুদার পছন্দ হয়েছে ব'লেই যে ওই নিরুপমার ওপর মলিনার এত বিরূপতা একথা ভুল।

তা কথনই হ'তে পারে না…এই সব ভাবতে ভাবতে মাছের কালিয়াতে চিনির বদলে দ্বিতীয় বার লবণ দিয়ে সেটা অখাদ্য করে ফেলল মলিনা।

নিরঞ্জন সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে সেটা আকাশের দিকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল। তার মনে এখন আর সেই তরুণ বয়সের আবেগ কম্পনের কিছুই অবশিষ্ট নেই, তবু যেন এই মেয়েটির প্রতি তার কেমন একটা মায়া পড়েছে মনে হয়। সে বেশ ভালো ভাবেই ভেবে দেখবার চেষ্টা করে। নিরুপমার মধ্যে কোনো ন্যাপিকামুলভ চপলতা নেই, বরং যেন তার কথায় বার্তায় সহজ সরল স্বল্পভাষায় আভিজাত্যই রয়েছে। তবু বলা যায় না—। কিন্তু অল্পবয়সী মেয়ে সে—কোনো অসঙ্গত কিছু যদি সত্যিই ঘটে থাকে তার জীবনে, সেটাই এত বড় ক'রে ধরা হবে কেন? নিরঞ্জন নিজেও কি যৌবনে কোনো চপলতা করে নি? মলিনাই কি আজও নিরঞ্জনকে ভুলতে পেরেছে?—তাই যদি হয়, তবে নিরুপমাকে বিয়ে করতে নিরঞ্জনের বাধা কি? পিছনে-ফেলে-আসা-দিনের ইতিহাস ত ইতিহাসের চেয়ে বেশি কিছু নয়—তার মূল্য কি আছে সত্যের কাছে?

মলিনা যেরকম অকৃত্রিমভাবে নিরঞ্জনের জীবনকে গৃহস্থ করবার চেষ্টা ক'রেছে তা অন্য কোনো মেয়ের পক্ষেই সম্ভব হ'ত না। নিরঞ্জন ত ওকে বার বার আঘাত ক'রেছে—চিনতে না পারার ভাণ ক'রে, চিঠির উত্তর না দিয়ে। আরও ছোট বড় অনেক আঘাতই সহ্য করতে হয়েছে মলিনাকে। তবু মলিনা তার বিয়ে দেবেই। এটা মলিনার সংকল্প। কিন্তু মলিনা কল্পনাই করতে পারে নি যে, নিরুপমাকে দেখেই নিরুদা এরকম তন্ময় হয়ে যাবেন। এখন ওর মনে হচ্ছে, যে কোনো মেয়েকে দেখেই পছন্দ হ'য়ে যেতো নিরুদার—আসলে পছন্দটা মেয়ে দেখার আগেই হয়ে ছিল।…তবে কি এতদিনের এই কৌমার্যের দম্ভ ষোল আনাই মেকী? তা হোক গে, মলিনার সে জন্য কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু নিরুপমার মত বেহায়া মেয়ে একবারে অসহ্য—!

বাইরের চটকটাই যে সর্বনাশের মূল একথা মলিনার জানতে বাকী নেই। নিরুপমাকে বিয়ে করে নিরুদার সুখ শান্তি সব নষ্ট হবে। ওই আগুনের মত মেয়ে—সে যে ঘরে বসে বসে ঘর ভাঙবে। আজ যেটা মিষ্টি হাসি, কাল সেটা মৃত্যুবাণ। অতএব মলিনা নিরঞ্জনের বিয়ে হতে দেবে না এখানে, কিছুতেই না।

নিরঞ্জন মনে মনে স্থির করে, মলিনার উচ্চ আদর্শের মাপকাঠি প্রশংসনীয় হ'লেও নিরুপমাকে এভাবে অপছন্দটা সমর্থন করা যেতে পারে না। মলিনা হাজার খুঁজেও এর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে পাবে কি? তা ছাড়া রূপটাই ত সব নয়, রূপের আধারে যে মনটা, তার মাধুর্যই ত আসল সত্য রূপ, সেখানে তুচ্ছ দৈনন্দিন গ্লানিমাকে বড় করে দেখা ভুল। এটা অন্ততঃ মলিনার বোঝা উচিত। মলিনার স্বামী ত তার এবং নিরঞ্জনের পূর্বরাগের কথা জেনেই বেশ শান্তিতে ঘর করছে। মলিনাকে বিন্দুমাত্র অনাদর করে না সে। না, না, মলিনা ভুল করছে। সে জেনে শুনে পুনরায় ভুল করবার সুযোগ দেবে না কাউকে। নিরুপমাকে সে নিশ্চয় বিয়ে করবে। এর জন্যে যদি মলিনাকে না জানিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করতে হয় তাতেও নিরঞ্জন মোটেই পশ্চাৎপদ হবে না। বার বার সে ভুলের মাশুল দিয়ে দেউলে হতে প্রস্তুত নয়।

নিরঞ্জন সেইদিনই বিকেলে একলা গিয়ে নিরুপমার বাবাকে পাকা কথা দিয়ে এল। বললে—বিয়ের কথা কিন্তু এখন কাউকে জানাবেন না। মেয়ে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আপনাদের হালিসহরে গিয়ে বিয়ে দিতে হবে। নিরুপমার বাপ বললেন—সে কি ক'রে হবে?

নিরঞ্জন বললে—ওখানে যা কিছু ব্যবস্থা আমিই করব। আপনাদের কিছুই ভাবতে হবে না। শুধু মেয়ে নিয়ে বিয়ের একদিন আগে রওনা হবেন। দেখ্‌বেন মলিনারা যেন জানতে না পারে।

নির্মল বসে ছিল ছাদের ওপর। বেলা সাড়ে নটার সময় এই রোদ পিঠে এবং মাথায় চাপিয়ে বসে থাকাটা খুব মনোরম নয়, যেহেতু গরমকালের রোদটা নরম নয়। কিন্তু এ-বাড়ির আর কোথাও এতটুকু নিরিবিলি নেই। বাবার সঙ্গে বচসা করে মনটা নির্মলের খিঁচড়ে গিয়েছে। দুখানা ঘরের বদ্ধ বাতাসে যেন বিষ ছড়ানো রয়েছে। তাই নির্মল ঘর ছেড়ে ছাদে উঠে এল। অনেকদিন পরে সে সকালবেলা ছাদে এসেছে। বি-কম পরীক্ষার আগে অবশ্য এই ছাদই ছিল তার আশ্রয়। এখানে প্রাচীরের ছায়া হিসেব করে, সরে সরে বসে বেলা দশটা সাড়ে-দশটা, কোনো কোনো দিন এগারোটা পর্যন্তও ছাদে পড়াশুনো করত নির্মল। তারপর আর ছাদের সঙ্গে সকালবেলা কোনো সম্পর্কই ছিল না ইদানীং।

জয়শ্রী পিছন থেকে প্রশ্ন করল—"একা-একা এখানে বসে কি হচ্ছে?"

নির্মল গম্ভীরভাবে জবাব দিল—"পায়রা ওড়ানো দেখছি।"

—"কিন্তু কই কাক ছাড়া ত কিচ্ছুই নেই আশপাশে!"

—"আমাদের ভাগ্যে কাকই ত পায়রা। একটু মানিয়ে নিতে পারলেই হল।" নির্মল তিক্ত হাসি হেসে ম্লান কণ্ঠে উত্তর দেয়।

জয়শ্রী বললে—"কি এমন দোষ করেছি যে, আমাকেও উড়িয়ে দিচ্ছেন?"

নির্মল এবারে জয়শ্রীর মুখের পানে তাকিয়ে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল।

জয়শ্রী আস্তে আস্তে বললে—"একটা কথা বলছিলাম, শুনতেই হবে।"

—"তোমার কথা কেউ কোনো দিন শুনেছে, এক এই আমি ছাড়া?"

জয়শ্রীর চোখেমুখে কি এক নিবিড় অনুভূতির ছায়া পড়ল, ও আরও কাছে এসে নির্মলের মাথা ছুঁয়ে বললে—"হাতখানা দেখি।"

চমকে উঠ্‌ল নির্মল। জয়শ্রীর দুঃসাহস যে কল্পনার সীমাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। মধ্য-কলকাতার ভাড়াটে বাড়ির ছাদ, আশপাশে এর চেয়ে উঁচু বাড়ির অভাব নেই। এখানে এই দিনেদুপুরে ওদের এই ঘনিষ্ঠতা! তা ছাড়া জয়শ্রীর মত কুণ্ঠিত লাজুক মেয়ে যে এরকম স্পষ্ট ভাষায় বলতে

পারে 'হাতখানা, দেখি' তা সে কোনোদিন ভাবতেই পারে না। যদি এমন হত যে রাত্রির জ্যোৎস্নার ওড়নায় ছাদের সম্মুখে রহস্যের পর্দা ফেলা রয়েছে, তখন হয়ত হাতখানা চাওয়ার মধ্যে তেমন দুঃসাহসিক কিছু থাকত না। কিন্তু এ কী কাণ্ড!—তবু এই দাবীর মধ্যে যেন আদেশের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। নির্মল যন্ত্রচালিতের মত ডান হাতখানা তুলে দিল। জয়শ্রী দুহাত দিয়ে নির্মলের হাতখানা ধরে কি যেন একটা গুঁজে দিয়ে হাতখানা মুঠো বেঁধে দিয়ে বললে—"হাত বন্ধ করে থাকুন। চোখ বুজে বসে দশবার 'পায়রা পায়রা' জপ করে হাতের মুঠো খুলবেন।"

এতক্ষণে নির্মল বাঁ হাত বাড়িয়ে জয়শ্রীকে আটক করে ফেলেছে! এবার ডান হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে দেখল, একখানা দশটাকার নোট!

—"এ কী! এ কি করেছ তুমি জয়া? টাকা—"

জয়শ্রী রুদ্ধ নিশ্বাসে চাপা গলায় জবাব দিল, "আঃ ছাড়ুন, কেউ দেখতে পাবে। ওটা আপনার কাজে লাগাবেন। সেই যে দরখাস্ত—"

নির্মল ছাড়ল না, আরও শক্ত করে ধরল জয়শ্রীর হাত—"খামোখা এটাকা দিতে এলে কেন? এ তুমি নিয়ে যাও—ছিঃ!"

—"আপনার যে দরকার। আঃ, শীগ্‌গির ছেড়ে দিন। বৌদি বাথরুমে ঢুকেছে, সেই ফাঁকে এসেছি। এখুনি বেরুবে। ছেড়ে দিন।" মিনতিকরুণ কণ্ঠে জয়শ্রী যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে।

নিজের অজ্ঞাতেই নির্মলের হাত শিথিল হয়ে যায়। অবশ্য জয়শ্রী মুক্তি পেয়েও চলে গেল না।

নির্মল বললে—"এ টাকা তুমি নিয়ে যাও জয়া। এ আমি নিতে পারব না।"

—"না। নেবার দরকার নেই, ধার দিলাম।"

—"অসম্ভব। এভাবে টাকা নিয়ে—"

—"বেশ ত মাইনের টাকা হাতে পেলে সব আগে সুদ সমেত শোধ করে দেবেন! না, আপনার কোনো আপত্তি শুনব না—এবারে আমায় ছেড়ে দিন, কেউ টের পেয়ে যাবে।"

তাহলে জয়শ্রী সব শুনেছে? ছি, ছি, ছি,—। নির্মলের মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্‌ল। নিজের উপর বিরূপতার এমনিতেই অন্ত নেই—সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত বেকার ছেলের স্বাভাবিক বিরক্তি যেমন হয়ে থাকে এও তেমনি। নিরুপায়। উপার্জনশীল পিতার গলগ্রহ সে; সামান্য কোনো প্রয়োজনেও সেই পিতার উদারতার প্রত্যাশা করতে হয়। দৈনিক ট্রামভাড়া আর চায়ের খরচের জন্যও হাত পাততে হয় বাবার খয়রাতীর দরজায়।...আজকের বিষয়টা কিছু গুরুতর ছিল। সেজন্য তার প্রস্তুতি ছিল গত তিনটি দিনের প্রতি মুহূর্তের সংকোচ এবং সংশয়। অবশেষে আজ সকালে বাজারের ঝোলাটা নামিয়ে রেখে নির্মল রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একটু উচ্চগ্রামে স্বগতোক্তি করে—"আর চলবে না। কিন্তু একটা উপায় না করলে এভাবে বাঁচা যাচ্ছে না। মাছের বাজারের পাশ দিয়ে হাঁটতে ভরসা হয় না। কি দর হাঁকছে, উঃ—"

ঘরের ভিতর থেকে তার পিতা জবাব দিলেন—"সেই কথাটা বুঝে ছাখো। রুস্তবাজী করলে কি আর চলে? বলছি না একশবার, পিওনের কাজ তাতে লজ্জা কি? ঢুকে পড়তে পারলেই আশীটা টাকা এধার-ওধার করে—। তারপর বলং বলং বাহুবলং, বড়বাবু আছেন, আমি আছি—"

—"কি বললেন? পিওনের চাকরি—" বলে নির্মল এক লাফে ঘরের মধ্যে এসে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে পিতার দিকে তাকাল।

—"কেন, কেন, মারবি নাকি! পিওন তাই কি—তোদের মানে—"

—"যা বলেছেন ব্যাস—আর ওসব কথা মুখে আনবেন না। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ তায় গুরুজন—যাক গে। আমি বি, কম পাশ করেছি কি এই পিওন হবার জন্যে, নয়?"

—"হ্যাঁ বাবা বুঝেছি, বুড়ো বাপের সঙ্গে তর্ক করবার জন্যে—। আর বাজারের পয়সা মেরে সিনেমা দেখবার জন্যে—।"

পিতার এই উক্তির মধ্যে এমন একটা নীচতা আছে যার প্রতিবাদ করা নির্মলের মত মাজিত চেহারার ছেলের উচিত নয়, অতএব সে হুকুম করল সে হাঁক দিল—"এই হাব্‌লী, চা কি হল রে!"

পিতা খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বল্লেন—"আর সাত দিনের নোটিশ রইল। এর মধ্যে তোমার উজীর ওম্‌রাহের চাকরি না জোটে তাহলে পিওনের চাকরি নিতে হবে। তখন পছন্দ অপছন্দ শুনব না—"

নির্মল বল্‌লে—"চাকরি ত আমি প্রায় ঠিকই করে ফেলেছি। কিন্তু আপনি যেরকম শুরু করেছেন তাতে আসল কথাটাই বল্‌বার সুযোগ পাচ্ছি না।"

"মানে? টাকা? টাকাকাকা আর আমার কাছ থেকে পাবে না। আজ পর্যন্ত এই উমেদারীর যা খেসারৎ দিয়েছি তাতে একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। বলি বুড়ো হয়েছি বলে কি এতই বোকা হয়েছি নিমে—তুই যা বল্‌বি তাই মান্‌তে হবে!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নির্মল বল্‌লে—"বেশ ত, ধারই দিয়ে দেখুন। ওই চক্কোত্তি মশাই, দত্তবাবু, সরকারকাকাদের কাছে যে হারে সুদ নিয়ে থাকেন তাই দেবো। আপনি দশটা টাকা দিন—"

—"বলি বাপ হয়েছি বলে মানুষ নই না কি রে? খুব যে সুদ দেখাচ্ছিস্ জানিস, এককথায় তোর এবাড়ির অন্ন ঘুচিয়ে দিতে পারি। আমি নেহাৎ ভাল মানুষ তাই সহ্য করে যাচ্ছি—অন্ত কেউ হলে এমন ছেলের পিঠে নতুন নাগ্‌রা ছিঁড়ে ফেলত। উঃ, সুদ নেবেন, সুদ—।" বল্‌তে বল্‌তে নির্মলের বাবা আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ করতে করতে বল্লেন—"বলি দশ টাকা সেলামী কি জন্তে চাওয়া হচ্ছে শুনি!"

নির্মল জবাব দিল না। ছোটবোন চায়ের কাপ হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে একবার তাকিয়ে বল্‌লে সে—"যা, নিয়ে যা চায়ের কাপ—এবাড়িতে আর জল খাবো না। আমিও বাপের ব্যাটা—"

—"খুব যে তেল ফলাচ্ছ, তারপর জুটবে কোথায় শুনি!" নির্মলের বাবা চশ্‌মাটা কপালের ওপর তুলে দিয়ে প্রশ্ন করেন, সেই সঙ্গে পরিমাপ করতে চেষ্টা করেন ছেলের রাগের পরিমাণ।

নির্মল বল্‌লে—"কিছু না হোক, মুটে মজুরের কাজ ত জুটবে। পিওনের চেয়ে তা ভাল। নীচ কেরাণীদের ধমক খেতে হয়না অন্তত।"

—"তোর বাপ্‌ও এই কেরাণীগিরি করেই তোকে তেজচন্দর বানিয়েছে।

সেই কেরাণীদের হেনস্তা! বলি কেরাণীগিরি ছাড়া আর কি জুটবে রে!"

—"পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপনে খবরের কাগজ বোঝাই থাকে রোজ, সেগুলো থেকে একটা—"

—"ওঃ, ভারি আমার মেনন্-রেড্ডি-রমন্-সহায় এলেন রে! বলি তোর জন্যে নাকি ওসব চাকরি। ওরে বাপ আমার, রক্ত আমাদেরও গরম ছিল এককালে। ছেড়াকাঁথায় শুয়ে ময়ূর সিংহাসনের মেজাজ আমরাও দেখিয়েছি। বলি লাফ-ঝাঁপ ত অনেক করলি দিনে দশখানা দরখাস্ত পেছনে পাঁচটাকা গচ্ছে খরচ করিয়ে এলি এতকাল ধরে, কিন্তু কিছু ফল হল কি?"

নির্মল চিঁড়ে ভেজাবার কায়দা জানে, তাই সে হঠাৎ সুর নরম করে বল্লে—"আচ্ছা এইবারের মত দিয়ে দেখুন দশটা টাকা। আমি বলছি এ চাকরিটা আমার হবেই। এই তিনদিনে আমি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে ফেলেছি। এখন শুধু ফরম কিনে দরখাস্তটা করে দিতে যা দেরি—!"

কিন্তু একথায় কোনো ফলোদয় ঘট্ল না। নির্মলের পিতা ঝাড়া জবাব দিয়ে দিলেন—"নাঃ, আর একটি কপর্দকও আমি জলে ফেলতে পারব না। যা-ই মনে করো—"

নির্মল যে মুহূর্তে বুঝল যে, নরম কথায় কাজ হাসিল হবে না সেই দণ্ডেই তার প্রশান্ত নম্র মূর্তি পুনরায় অন্তর্হিত হল, সে বল্লে—"তা কেন দেবেন, এতে যে আমার ভাল হতে পারে। তার চেয়ে রেসে গিয়ে টাকা ওড়ানো আপনার পক্ষে শোভা পায়। আমি সব জানি, কিছু বলি না বলে তাই—" ক্রমশঃ নির্মলের গলার স্বর উচ্চতর গ্রামে উঠ্তে শুরু করেছে।

তার বাবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"বেশ করি, নিজের পয়সায় করি কারুর কাছে হাত-পাততে যাই না। আমার পয়সা নিয়ে আমি যা খুশি তাই করব—খেল্ব রেস, তাতে কার বাপের কি বল্বার আছে?"

নির্মলের মা ঘরে ঢুকে বল্লেন—"আঃ, কি হচ্ছে কি তোমাদের? দাও না বাপু দশটা টাকা, সত্যি যদি চাকরিটা হয়েই যায়।" তারপর ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে তিনি বল্লেন—"আর তোরও কি দিন-দিন বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাচ্ছে নিমু, আশপাশের ঘরে সবাই কান পেতে এইসব কেলেঙ্কারী শুনছে ত!"

—"বলো, তুমিই বলো। লেখাপড়া শিখেছেন উনি। দেবো না টাকা, কিছুতেই দেবো না, কেন ও রেসের খোঁটা দিতে গেল—আমায় ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবে?"

কর্তার মেজাজ রীতিমত বিগ্‌ড়ে গিয়েছে। তবু গৃহিণী বুঝিয়ে বল্‌বার চেষ্টা করেন—"নিমু আজ দুদিন ধরে অনেক ঘোরাঘুরি করে কোথায় কোন্ কাউন্সিলের মেম্বার, কোথায় কে কংগ্রেসের কর্তাদের সব ধরাধরির ব্যবস্থা করেছে—চাকরিটা একরকম পাকাই হয়ে গেছে। এখন কি দরখাস্তর কাগজের দাম না কিসের জন্যে আটদশ টাকা লাগবে বল্‌ছিল। আমাকেও কাল বলেছে—তা আমি বলি যে, টাকা আমি কোথায় পাবো বল্! যাকে বল্‌লে হয়—"

মায়ের কথা শেষ হবার আগেই নির্মল মাঝখান থেকে বলে দিল—"ও টাকা আমি চাই নে। তাতে যদি উপোস করে পথে শুকিয়ে মরি সেও ভাল।" বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা ছাদের উপর উঠে গেল।

কেন যে রাস্তায় না বেরিয়ে ছাদে উঠেছিল নির্মল নিজেও তা বুঝতে পারে নি। কিন্তু এখন বুঝেছে ব্যাপারটা বড়ই বাঁকা চেহারা নিয়েছে। এরকম ভাবে মুখের উপর পিতাকে অপমান করার মধ্যে গৌরব কিছু নেই, বুদ্ধিমত্তাও নেই। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল কি, যখনই তার বাবা টাকা দিতে রাজী হলেন না, তখনই নির্মলের মনে হলো যে তিনি তার পাকা চাকরিটা কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছেন, অতএব—!

কিন্তু জয়শ্রী টাকা পেল কোথায়!

জয়শ্রী তাকে কেন টাকা দিল?

নির্মল এবং তার পিতার কথোপকথন পুরোপুরি শুনেছে জয়শ্রী—তাতে কোনো ভুল নেই। নইলে টাকা দিতে আসবে কেন?

এখন নির্মল কি করবে? দরখাস্তটা করেই দেবে? যদি চাকরিটা না পাওয়া যায় তাহলে আর এ-বাড়িতে মুখ দেখানো যাবে না। অবশ্য আর কারও কথা তত ভাবছে না নির্মল কিন্তু জয়শ্রীর কাছে সে মুখ দেখাতে পারবে না। কি করবে নির্মল? টাকা ফিরিয়ে দেবে জয়াকে?

কিন্তু—না, আপাতত এবাড়ীর এলাকা থেকে বেরিয়ে ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার।

নির্মল সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা রাস্তা ধরে হাঁট্‌তে শুরু করল। ওর পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জয়ার মুখখানা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল।

জয়া যেন বলছে : এ চাকরি তুমি পাবে আমি জানি।

নির্মল : কি করে জান্‌লে ?

জয়া : নইলে ওরকম জোর গলায় তুমি তকরার করতে পারতে না।

নির্মল : তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ ?

জয়া : শুধু কি আজ ? তুমি যখন যে কথাটি বলো আমি রান্নাঘরের দেয়ালে কান লাগিয়ে শুনতে পাই। আমি ত আর কিছু শুনিনে। জানো ওই জন্যেই রান্না এক-একদিন অখাদ্য হয়, কেউ মুখে তুল্‌তে পারে না, বৌদি দূর-দূর করে।

নির্মল : আচ্ছা জয়া তুমি এত গঞ্জনা সহ্য করে কেন আমার কথা দেয়ালে কান লাগিয়ে শোনো ?

জয়া : আমার আর কেউ নেই তুমি ছাড়া।

নির্মল : কি করে জান্‌লে ? কে বলেছে একথা ?

জয়া : বা রে একথা কি আর কেউ বলে নাকি—আমার মনই বলেছে।

নির্মল : আচ্ছা, আমি যদি চাকরি না পাই ?

জয়া : যাঃ, তা হতেই পারে না। আমি জানি এ চাকরি তুমি পাবেই।

নির্মল : কিন্তু চাকরি না পেলে আমি ত বেকারই থাকব।

জয়া : আর আমিও কুমারী—।

সহসা নির্মলের দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। কঠিন দুটো মুঠো দিয়ে সে যেন এখনই এই মুহূর্তে পৃথিবীর সকল বাধা প্রতিরোধকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে উদ্যত হয়। জয়ার বন্দিনী দশা তার মনকে 'দীর্ঘদিন পীড়া দিচ্ছে। মধ্যবিত্ত ঘরের বেকার যুবকের সমবেদনা ত অনূঢ়া গঞ্জনালাঞ্ছিতা' কুমারীর প্রতি নদীর স্রোতের মতই গতিপ্রবণ।

জয়শ্রী নীচে নামতেই বৌদি বললেন—"আচ্ছা জয়া, বলি তোর বেহায়াপনার জ্বালায় কি আমিই শেষে গলায় দড়ি দেবো? এই গরমে রোদ পোয়াবার দরকার ছিল কি? ওদিকে ঘরদোর খোলা পড়ে হাঁ-হাঁ করছে। বাড়িতে ত একবার নেই বললেই অমনি নেই—ঘট-বাটির পাখা গজায়, চোখের ওপর হরদম চুরি হচ্ছে। বলি দিনদিন ধিঙ্গী হচ্ছ, একটু সমঝে চলো। ছাদে তোমার কি মধু ছিল শুনি!

জয়া কাঠের পুতুলের মত নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

বৌদি চাপা গলায় বললেন—"ঢের ঢং হয়েছে, এখন উনুনের ডালটি নামাও গিয়ে। সংয়ের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে—"

জয়া আস্তে আস্তে চলে গেল। অন্য সময় হলে একটা ছোট্ট জবাবে তার বৌদির মেজাজ আরও বিগড়ে দিয়ে যেতো—কিন্তু এখন বৃহত্তর একটা অন্যায়ের গ্লানিতে ওর মনটা সঙ্কুচিত এবং ভীত রয়েছে বলে মাথা না তুলেই চলে গেল। দাদার পকেট থেকে সদ্য ওই দশটাকার নোটখানি সরিয়েছে জয়া। একমুহূর্তের মধ্যে এতবড় দুঃসাহসিক কাজটা জয়া যে কি করে করল তা ও নিজেও জানে না। এর সাংঘাতিক পরিণামের কথা ভেবে কেন জয়া শঙ্কিত হল না? বরং একটা মহৎ কিছু করবার মধ্যে যে গভীর তৃপ্তি আর আনন্দ থাকে সেই ধরনের শান্তি আর আনন্দে ওর মনটা ভরপুর!

ডাল নামিয়ে যথারীতি তরকারী চড়িয়ে দিল জয়া। এরপরই দাদার ভাত চাই। আফিসের বেলা হয়ে গেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সরকার মশাই-এর 'দুর্গাশ্রীহরি' স্মরণের বিকট চীৎকারে। সরকারমশাই যখনই পথে বেরোন তখনই দারোয়ানী করবার জন্য ঠাকুরদেবতাদের হাঁকডাক করেন, জয়ার খুব হাসি পায়, ওর মনে হয়, সরকার মশাই বুঝি বলতে চান—শ্রীহরি, দুর্গা, তোমরা সবাই আমার চারপাশ আগলে চলো যাতে আমি কোনো বিপদে না পড়ি।

দাদার গলা পাওয়া যাচ্ছে। জয়া রান্নাঘরের ঝোলাধরা দেয়ালের গায়ে যে টিকটিকিটা বসে বিশ্রাম করছিল তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করতে চায়—'চাকরিটা পাকা ত?' অর্থাৎ যদি ওই টিকটিকিটা 'ঠিক-ঠিক'

বলে ভরসা দেয় তাহলেই জয়া নিশ্চিন্ত মনে আজকের ,অবশ্যম্ভাবী গঞ্জনা লাঞ্ছনার মধ্যে হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।...দাদার গলা পাওয়া যাচ্ছে, এবার থালায় ভাত বাড়তে হবে। কিন্তু টিকটিকিটা চুপ করে বসে রয়েছে কেন!

বৌদির গলা পাওয়া গেল। জয়া ব্যস্ত হয়ে থালা নিয়ে ভাত বাড়তে বসে যায়।

ওদিকে বাড়ি মাথায় তুলেছেন বৌদি—"এ-বাড়িতে আর থাকা চলবে না। আখ্না-আখ চুরি লেগেই রয়েছে। বলি, গেল ত দশ-দশটা টাকা, কাকে চোর ধরতে যাই।..."

জয়া রান্নাঘরে বসে বসেই কেঁপে উঠল—হাত থেকে বাটিটা পড়ে ঝন্-ঝন্ করে যেন আর্তনাদ জানায়—জয়ার মনের হুবহু প্রতিধ্বনি।

বৌদির গলায় আরও ঘোষণা হল—"ওই যে গুণবতীর কাজ। হাত-পা ত নয় বরকন্দাজের লাঠি—দমাদ্দম এটা ফেলছে ওটা ভাঙছে।"

শান্ত কণ্ঠে জয়ার দাদা বললেন—"আবার আপিসের সময়ে মিছে চীৎকার করছ কেন! যা যাবার তা ত গিয়েছেই। চুপ করো।"

—"তোমরা ভাই-বোন সব বড়লোক, তোমাদের গায়ে লাগে না, আমার বাবা সাড়ে পাঁচশ টাকা মাইনে পেলেও গরীব মানুষ, গরীবের মেয়ে আমি, আমার গায়ে জ্বালা ধরে, তাই অশৈরন দেখ্‌লে চুপ করে থাকতে পারিনে। বলি টাকার কি হাত-পা আছে, যে উড়ে যাবে? মানুষের অভাব পড়লে— অভাবী লোক বাড়িতে থাকলে কি আর চুরি বন্ধ হয়।"

জয়া ভাতের থালা নিয়ে শোবার-খাবার-বসবার অদ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করল। অন্যদিন বৌদি ঠাই করে রাখেন, আজ করেন নি—অতএব জয়া আবার রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে থালা নামিয়ে রেখে ফিরে এসে মেঝেটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে, আসন পেতে, জলের গ্লাস রেখে চলে গেল। ওর এই নীরবতাই স্বাভাবিক প্রকাশ—দাদার বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর, জয়ার নীরবতা গত-দুবছরের, মায়ের মৃত্যুর পর থেকে।

দাদাকে বসতে বলে জয়া বারান্দায় গিয়ে বৌদির হাত ধরে টেনে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। বৌদিও চুপ করে গেলেন।

দাদা খেতে বসে বললেন—"তাই ত রে জয়া এ হপ্তার রেশান
জার হবে কি দিয়ে ! দশটা টাকা পকেট থেকে সরে গেল—কে যে
নল !"

জয়া নীরব। বৌদি ওর মুখের পানে তাকিয়ে আছেন, অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে,
কে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—"বলো, একটু সমঝে দাও—হুট্
রে ছাদে যেন না যায়,—আমি বাথরুমে গিয়েছি দেখেই ছুটলেন ছাদে!
দই ফাঁকেই গিয়েছে টাকা—কে নিয়েছে তাও আমি জানি।"

—"কে ?" জয়ার দাদা প্রশ্ন করেন।

—"আবার কে ? ওই যে গো তোমাদের দিগ্‌গজ—"বলে চোখের
াষাতে তিনি নির্মলকেই ইঙ্গিত করেন।

—"যাঃ, নির্মল তেমন ছেলেই নয়।" জয়ার দাদা বললেন—"ওরকম
ভদ্র মন আমাদের মত সাধারণ ঘরের ছেলেদের দেখা যায় না।"

—"তুমি ত সবাইকেই ভালো ছাখো। ওর বাপের স্বভাব যে আমি
ানি।" বলে বৌদি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে জয়শ্রীর দিকে তাকাল।

জয়শ্রী বললে—"নির্মলদা কিছুতেই এত নীচ কাজ করতে পারে না।
ার নামে এ অপবাদ দিলে মহাপাপ হবে।"

—"অমনি গায়ে লেগেছে বুঝি ? কেন, নির্মলদা পীর না দেবতা ?"

—"তিনি পীর-দেবতা না হলেও এ-বাড়িতে সত্যিকার মানুষ যদি কেউ
াকে ত তিনিই আছেন।"

বৌদি জয়ার এ-কথায় জলে উঠলেন—"বটে বটে! বাড়ির সোমত্ত
াইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে আড়ালে ফিসির-ফিসির করলেই সত্যিকার মানুষ
য়—তুই কি ভাবিস জয়া, আমি ঘাস খাই ?"

দাদা হাত গুটিয়ে অর্ধভুক্ত অবস্থায় ওঠবার উপক্রম করছে দেখে জয়া ছুটে
গিয়ে দাদার হাত চেপে ধরে বসালে—"দাদা, আমার অপরাধ ক্ষমা করো,
আর এরকম কখনো হবে না। কিছুতেই হবে না। তুমি মুখের ভাত ফেলে
উঠো না আমার মাথার দিব্যি।"

বৌদি ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার দাদা ও বোনের দিকে তাকিয়ে দেয়ালের

দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দাদা নীরবেই আহার সমাপ্ত করতে লাগলেন, অফিসের বেলা হয়ে গেছে।

জয়া মনে মনে প্রস্তুত করতে লাগ্‌লো নিজেকে সারা দিনের কাজের জন্য। এক-এক বার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল কেন শুধু শুধু নির্মলদার সাফাই গাইবার জন্য গাল বাড়িয়ে চড় খেতে গেল। আবার নিজের মনেই বল্‌লে: বেশ করেছি! অন্যায় কিছু করিনি।

দাদা অফিসে বেরিয়ে যাবার পর অনন্ত অবসর; মনে মনে কত রঙীন ছবি আঁকে জয়শ্রী ওই নোনাধরা ধোঁয়ায় ধূসর রান্নাঘরের ঝুলপড়া দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। গঞ্জনার ভারী বোঝাকে যৌবনের শক্তিমতী মন অনায়াসে তুচ্ছ করে ফেলে দিয়ে নিজের কল্পনার উড়ো ছবির কাছে ঢেলে দেয় সব কিছু।

আজও দিয়েছে জয়শ্রী, মনের সুতো ছেড়ে দিয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে ও। একা চুপ করে বসে বসে টিক্‌টিকিটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে—মন? মন দেখ্‌ছে:

নির্মল চাকরি পেয়েছে। তারপরই আলাদা বাড়ির সন্ধান হল। রূপকথার দৈত্যকে যেমন হুকুম করলেই হাসিল হয় সব কাজ—এও তেমনি, বাড়ি পাওয়া গেল। সস্তায় দুখানা ঘর। জয়শ্রী নিজে থেকে একটি দিনও বলেনি নির্মলকে যে, আমায় বিয়ে করো। বরং ও বলেছে, আমি তোমার কাছে কত তুচ্ছ, কীইবা আছে আমার? তুমি লেখাপড়া-জানা বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে বরণ করলে কত সুখী হবে!...নির্মল জয়ার গাল টিপে দিয়ে বলে: তোমার কাছে আর কিছু চাই না, তুমি ত আছ। আর তা ছাড়া তোমার মূলধন দিয়েই এত ভাল চাকরি হল, সুদ চেয়েছ—তাই সুদে আসলে আমাকেই দিয়ে দিচ্ছি।...কত রঙীন ছবি। একসঙ্গে সিনেমা যাওয়া! জামা-কাপড় কিনতে যাওয়া! ঘরদোর সাজানো আর বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে, চায়ের পার্টি দেওয়া!...ভাবতে ভাবতে জয়শ্রী ডুবে যায়, তলিয়ে যায়, সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধুই ছবির পর ছবি এঁকে চলে!...তাড়া বাড়িতেই ত চিরকাল থাকবে না ওরা, অতএব বাড়ি করবার জন্যও সাশ্রয়

করে কিছু কিছু সঞ্চয়ের দিকে মন রাখতে হবে।...নিজের বাড়ি, সে কি কোনো দিন হবে? কেন হবে না, চেষ্টা করলে কি না হয়। জয়া ভুলে গেছে সব কিছু ইচ্ছাশক্তির প্রচণ্ডতম মোহাচ্ছন্নতায়।

নির্মল বাড়ি ফিরল ভরা দুপুরে ঘর্মাক্ত কলেবরে। তার চোখ মুখ যেন গন্‌গনে উনুনের মত রাঙা—আগুন ছুট্‌ছে তার রাঙা মুখের আভাতে। অনেক ঘোরাঘুরি করেছে। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে অনেক। জয়াদের ঘরের সামনে এসে দেখ্‌ল সে, ফাঁকা ঘরে জয়শ্রীর বৌদি একখানা নভেল পড়ছেন বুকে বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে। বইখানা নির্মলের খুব পরিচিত—তারই বন্ধুর লেখা উপন্যাস। একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকল সে চুপ করে, চারিদিকে চোখ বুলিয়ে জয়াকে দেখতে পেল না। অবশ্য জয়া যে কোথায় থাকতে পারে তা নির্মলের অজানা নয়। তবু বৌদিকে জিজ্ঞাসা করল—"বৌদি ওটা কি পড়ছেন?"

বৌদি উঠে বসে বল্লেন—"এই একখানা গল্পের বই। তা এত বেলা অবধি কোথায় ঘুরছিলে—"

—"বেকারের আর বেলা অবেলা কি বলুন!" বলে নির্মল মাথা নীচু করে রইল। আত্মগ্লানিতে সে যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়। জয়ার সামনে পড়লে আরও নীচু হতে হবে। সকালে যে দম্ভ, যে দর্প, যে ফাঁকা আস্ফালনে সে পিতাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছে, যার ফলে জয়ার সরল বিশ্বাসী মন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অর্থ সাহায্য নিয়ে নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এসেছে—সে সমস্ত নির্মলের মনকে কুণ্ঠিত করেছে। তৃণের মতই তুচ্ছ করে নিজেকে দেখতে পেয়েছে নির্মল এই কয়েকঘন্টা নিষ্ফল ঘোরাঘুরির মধ্যে দিয়ে। সে আর জয়ার কাছে মুখ দেখাতে চায় না। নির্মল দশটাকার নোটখানা জয়ার বৌদিকে দিল।—"দিয়ে দেবেন। আমি আর এ মুখ দেখাতে চাইনে। কাজ যখন পাকা নয় তখন এ টাকা ত জলে ফেলার মতই মিথ্যে। যদি তেমন দরকার বুঝি চেয়ে নেবো'খন।"

বৌদিও হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলেন, বললেন—"আপনি নিয়েছিলেন বুঝি, আমি তখনই ওঁকে সেকথা বলেছি। তাতে কি হয়েছে। দরকার থাকলে চাইবেন বই কি—চেয়ে নিলে কোনো গোলমালই থাকে না।"

নির্মলের কানে এসব কিছুই গেল না। সে মাথা নীচু করে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল—জয়ার টাকাটা যেন বিবেকদংশনের মত এতক্ষণ প্রতি-নিয়তই পীড়া দিয়েছে।

জয়া তখনও ছবি আঁকছে একা-একা রান্না ঘরে বসে। টিকটিকিটা নড়ে উঠেছে—ওদিকে বুঝি পিঁপড়ের সারি নজরে এসেছে তার। সে আনন্দে ঠিক-ঠিক, টিক-টিক করে তরল স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে গেল। জয়া খুশি হয়ে টিকটিকির দৈববাণী শুনল—স্বস্তির নিশ্বাসে ওর উথল বুক ফুলে উঠল।

আসর বেশ জমে উঠেছে। কোনো এক বিশিষ্ট শিল্পীর জন্মোৎসব, কাজেই শহরের বাছা বাছা বড় মানুষের সমাবেশ। শিল্পী, সমালোচনার দিগ্‌গজ, অভিনেতা, চিত্রতারকা, লেখক, কবি, গায়ক, ব্যবসায়ীদের মধ্যে মান্য-গণ্য প্রায় সকলেই এই উৎসবের অংশীদার।

যাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে এই সমারোহ, সেই খ্যাতনামা শিল্পকুশলী মৃন্ময় দালাল মশাই হাসিহাসি মুখে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন এবং অভ্যাগতদের প্রত্যেকের দিকেই সচেতন যত্ন প্রদর্শন করবার জন্য ঠোঁটের হাসিটুকু অটুট রেখে ব্যস্তভাবে মস্ত হলঘরখানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়োদৌড়ি করছেন। মৃন্ময় দালাল ছবি ভালোই আঁকেন, এককালে যে তাঁর নিজের চেহারাও বেশ ভালো ছিল তার কিছু কিছু অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় বয়স্কতার প্রাধান্য ছাপিয়েও,—তা ছাড়া তাঁর আচার ব্যবহার খুবই মার্জিত। অনেক অশিষ্ট লোকের রটনা এই যে, মৃন্ময় দালাল শিল্প সৃষ্টির চেয়ে ঢের ভালো পারেন পরের মনকে জয় করতে। অবশ্য তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজকের এই জন্মদিনের অতিথি-সমাগম।

অনেকেই এসেছেন। উপহার আর মধুর বচনে হলঘরখানা ছাপিয়ে উঠেছে। প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল, বিখ্যাত গায়িকা অগ্নিমিত্রা গান গাইবেন—কিন্তু অনবরত লোকজন আসা যাওয়ার এমন নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বইছে যে এর মধ্যে গান জমবে না ব'লে অগ্নিমিত্রা তাঁর কোকিলকণ্ঠ দিয়ে কেবল শাদা বাক্যেরই ঝর্ণা বইয়ে দিচ্ছেন। দেরাদুন চালের পোলাও-এর বদলে সাদা ভাত আর কি! রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দলের নেতারাও ঝাঁঝালো বক্তৃতার পথ এড়িয়ে গল্পগুজবের দিকেই চাকা ঘোরাচ্ছেন খুব সন্তর্পণে! এই একটি বাড়িতে এসে নাকি কেউ স্বেচ্ছায় বিরোধের ছায়া মাড়াতে চায় না—মৃন্ময় দালালকে সকলেই রীতিমত সম্ভ্রম করে থাকে।

বাইরে একখানা গাড়ি এসে থামতেই মৃন্ময় বাবু উৎকর্ণ হয়ে গায়ের উড়ুনীটা সামলে উঠে দাঁড়ালেন। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের সঙ্গে

আলোচনা করছিলেন তিনি আত্মজীবনী সম্পর্কে। মধ্য পথেই সে আলোচনায় ছেদ পড়ল ব'লে মৃন্ময়বাবু নিজেও একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেন, কিন্তু উপায় নেই।— নতুন কেউ এসেছেন নিশ্চয়, যথাযথ সমাদর কর্তব্য। অতএব তালতলার চটি জোড়া যতদূর সম্ভব পায়ে আট্‌কে নিয়ে, হাসির পালিশখানা ঠোঁটের ওপর মাজ্‌তে মাজ্‌তে দরজার পানে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন—তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। মনে মনে একটা হিসেব কষ্‌ছিলেন তিনি, এখন—এত দেরী ক'রে আর কে আসতে পারে? সবচেয়ে দেরী করার সম্ভাবনা ছিল যার (এমন কি যার পক্ষে নেশার মাত্রাধিক্য হেতু না আসাটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক) সেই লেখক-পরিচালক সুজ্যোতিকুমার পর্যন্ত যথা সময়ে এসে সকলকে বিস্মিত ক'রে দিয়েছে। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই দালাল মহাশয় ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মনে মনে অনুসন্ধান করতে থাকেন—তাঁর হাসির পালিশটুকু সেই মুহূর্তে কোথায় যেন মেঘে ঢাকা পড়ে যায়। তাঁর এ চিন্তা যদিও দুশ্চিন্তা নয় তবু স্মৃতিশক্তির প্রখর হিসেবকে সব সময়ে তিনি কার্যকরী রেখে চলেন। এটা মৃন্ময় দালালের চরিত্রগত অভ্যাস। কাজেই দুশ্চিন্তা না হ'লেও প্রখরচিন্তা বই কি! নিমন্ত্রিতেরা সকলেই এসে গেছেন—।

মৃন্ময় দালালের চিন্তাজালকে ছিন্ন ক'রে যিনি এলেন সেই নবাগতা আজকের দিনের এই আসরে যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি একটা অপূর্ণ দিককে পূরণ করার অধিকারিণী হিসাবে অপরিহার্য। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা উচিত এককালে ইনি মৃন্ময় দালালের শিল্প-সাধনার উৎসমূল ছিলেন। অবশ্য আজকের এই জন্মোৎসবের আসরে ইনি অনাহূতা।

মৃন্ময় দালাল মুহূর্তের মধ্যে বিস্ময়মূঢ়তা কাটিয়ে বললেন—"এস, এস, রাজেন্দ্রাণী এসো। ঠিক তোমারই অভাব যেন অনুভব করছিলেন এঁরা সকলে—"

রাজেন্দ্রাণীর রূপ ও রুচিতে তারুণ্যের বিচ্ছুরণ সুপরিস্ফুট। আয়তনেত্রের ভ্রূ-ধনুতে দীর্ঘ কটাক্ষের বিলম্বিত নৃত্য সংযোজন ক'রে রাজেন্দ্রাণী বল্‌লেন—"আমার তো তা জানা ছিল না। এমন কি, খবরের কাগজে সভাসমিতির ফিরিস্তি যদি নজরে না পড়ত, তাহলে এই তৃষিত ভক্তেরা আমাকে

দেখবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিতই হ'তেন।" তারপর রুমাল দিয়ে কণ্ঠের গজমোতির পার্শ্বদেশ সযত্নে মুছতে মুছতে তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বললেন—"আচ্ছা দালাল মশাই, আপনার এই দেশ জোড়া নামের পিছনে কি এক বিন্দুও আমার স্বকার্য নেই? আপনি ভুলতে চাইলেও আমি আপনাকে সে ভুল করতো দেবো কেন!"

রাজেন্দ্রাণীর কথা বলার ভঙ্গিতে দৃপ্ত তলোয়ারের দীপ্তি। দালাল-মশাই একটু স্তিমিত হয়ে গেলেন ওর সম্মুখে। আরও খানিকটা কাছে এসে কাতর দৃষ্টি দিয়ে অনুনয় করলেন সঙ্গোপনে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাঁর কণ্ঠস্বরে অন্য সুর বাজে—"অভিমানে ঠোঁট ফোলানো অভ্যেস তোমার আজও গেল না রজনী! তোমায় যে কত খুঁজেছি, কিন্তু এমন ডুব মেরে বসে থাকলে খুঁজে পায় কার ইয়ের সাধ্যি। সে যাক্, এই তুমি এসেছ যে এতেই আমার আজকের জন্মদিনে সত্যিকার আনন্দোৎসব হ'ল। এস, এস, এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসবে চলো।" ব'লে তিনি রাজেন্দ্রাণীর বাঁ হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন।

রাজেন্দ্রাণীর আগমনে একটা চাপা গুঞ্জন-আলোড়নের ঢেউ খেলে গেল। আসরের কলকণ্ঠ অন্তর্হিত হয়েছে। এক-একটি টুকরোতে দু-তিন-জন ক'রে শ্রোতা-বক্তার ছোট-ছোট দল যে কি এক জাদুবলে গড়ে উঠ্‌লো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে—তা কেউ বুঝতেই পারে নি। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই ত এই সব দলের কোন-না-কোনটার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। একমাত্র মৃন্ময় দালাল নিজে এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করলেন।

রাজেন্দ্রাণীকে হঠাৎ এই আসরে উপস্থিত হ'তে দেখে সকলেই বিস্মিত হয়েছে। অথচ এই রমণীটি এতবড় হলঘরের একজনেরও অপরিচিত নয়। অত্যন্ত সুপরিচিত কোনো মানুষকে দেখার মধ্যে এতখানি বিস্ময় খুব স্বাভাবিক বলা চলে না—এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়।

একজন উর্দি শোভিত বেয়ারা এসে রকমারী ঠাণ্ডা সরবৎ পরিবেশন ক'রে গেল। বেয়ারার হাতের বারকোষ থেকে একটি আনারসের সরবৎ উঠিয়ে নিয়ে মৃন্ময় দালাল রাজেন্দ্রাণীর সামনে ধরতে রাজেন্দ্রাণী খুশি হয়ে

যেন একটুকরো হীরেপান্নামাখানো হাসি উপহার দিল, বল্‌লে—"তা হ'লে এখনও মনে রেখেছ?"

মৃন্ময়ের চোখ দুটো একটু নরম চাহনিতে নিবিড় হয়ে যায়, তিনি কোনো জবাব দিতে পারেন না। রাজেন্দ্রাণী বাঁ হাত বাড়িয়ে সরবতের গ্লাসটা নিয়ে একটু চুমুক দিয়ে চারিদিকে তাকাল—"তাহলে এসে খুব ভুল করি নি!"

ওদিকে আর সকলকে যথাযথ সরবৎ দেওয়া হচ্ছে কি না তদারক করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠে গেলেন মৃন্ময় দালাল।

মৃন্ময় চলে যেতেই সুজ্যোতিকুমার উঠে এসে রাজেন্দ্রাণীর পাশে বসে বল্‌লে—"রজনী, তুমি এতদিন কোথায় উধাও হয়েছিলে?"

রাজেন্দ্রাণী গ্রীবা বাঁকিয়ে চোখ নাচিয়ে বল্‌লে—"আরে, তুমি! তোমার সঙ্গে যে কতদিন দেখা হয় নি। ভালো আছো নিশ্চয়। এখন তোমার নায়িকা কে?"

সুজ্যোতির চেহারায় বিষণ্ণতা ঢাকা থাকে না, সে বল্‌লে—"জীবনের ফুটপাতে কি ভিখারীর মত নায়ক নায়িকার ছড়াছড়ি দেখেছো তুমি?"

রাজেন্দ্রাণী উত্তর দিল না।

সুজ্যোতিকুমার যেন অনেক দূরের হাতছানি।

মৃন্ময় ফিরে এসে রাজেন্দ্রাণীর পাশে ঝুঁকিয়ে বস্‌লেন।

ততক্ষণে সুজ্যোতি ডুব দিয়েছে আপন মনের মাটি ছোঁবার জন্য গভীর জলে। নীচে, নীচে—অনেক নীচে—যেন অতল ব'লে সন্দেহ হয়, দম ফুরিয়ে যায়, আর নীচে যাবার মত শক্তি নেই। তবু সুজ্যোতিকে জোর ক'রে কে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে। পাতালপুরী। সেখানে রয়েছে রাজকন্যা—যে হাস্‌লে হীরে পান্না ঝরে, আর যার চোখের জলে মুক্তো টল্ টল্ করে—সেই রাজকন্যার খঞ্জনচক্ষুর দিকে তাকিয়ে সুজ্যোতির মন আথালি-পাথালি ঝড়ের দোলায় দুলছে। সে রাজকন্যাই ত এই রাজেন্দ্রাণী। রাজেন্দ্রাণী বলত—"আমার কাছে জমা রয়েছে তোমার নায়িকার মন। শিল্পী তুমি খুঁজে নাও সেই মনকে।"...হঠাৎ মৃন্ময় দালালের একটা কথার

ধাক্কায় সুজ্যোতিকুমার চেয়ে দেখ্‌ল, মৃন্ময় বল্‌ছেন—"কই হে কুমার বাহাদুর, একটা শুক্‌নো চুরুট-টুরুটই না হয় নাও!"

সুজ্যোতিকুমার যন্ত্রচালিতের মত একটা চুরুট তুলে নিয়ে ধরাতে লাগল। চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের ধাক্কায় সুজ্যোতির নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল সকলের অগোচরেই।

মৃন্ময় প্রশ্ন করেন রাজেন্দ্রাণীকে—"এতদিন কোথায় ছিলে?"

রাজেন্দ্রাণী বল্‌লে—"সে কথাটা আজ এই দশবৎসর পরে শুন্‌তে চাইছ কেন?"

—"এর মধ্যে কি কোনো খবরই রাখি নি ব'লে তোমার বিশ্বাস?"

পরস্পরের দুটি জিজ্ঞাসার মাথার ওপরে এসে দাঁড়াল আরও একটি প্রশ্ন—অবশ্য প্রশ্নকর্তা তৃতীয় ব্যক্তি। ইনি একজন খ্যাতনামা নেতা—"এই যে রজনী তোমাকে যেন অনেকদিন পরে দেখছি। সেবারে জেল থেকে বেরিয়ে তোমার হাতের মালা না পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সত্যি বল্‌তে কি তারপর থেকে আর জেলে যাবার লোভই নষ্ট হয়ে গেছে। মনে হয়, জেল থেকে বাইরে এসে যদি তোমার হাতের মালাই না পাই তবে কাজ কি দেশোদ্ধারের ইয়েতে!"

রাজেন্দ্রাণী হাসিতে লুটিয়ে পড়ছিল যেন, কোন রকমে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে—"একটু আস্তে বলুন, হয়ত আর কেউ শুনে ফেলে ফাঁস ক'রে দেবে খবরের কাগজে।"

এই সময়ে আলাপের সূত্র ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল দালাল মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ঝিনুক সকলের মাঝে পড়ে। তার চোখে জল ছল্‌-ছল্‌ করছে। মৃন্ময় কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ঝিনুক বল্‌লে—"শীগ্‌গির বলো, ছত্যি ক'রে বলো তুমি আমাকে বেশী ভালোবাসো—না, মাকে?"

মৃন্ময় একবার মেয়ের মুখের পানে তাকিয়ে পরক্ষণে রাজেন্দ্রাণীর দিকে তাকালেন। পিতার দৃষ্টি অনুসরণ করে ঝিনুকও রাজেন্দ্রাণীর দিকে তাকালো। ওর সরল চাহনিতে কেমন একটা ভীরু বিরূপতাই ফুটে ওঠে।

তারপর আবার নিজের প্রশ্নের জবাব দাবি করে বসল ঝিনুক—"নীগ্‌গির বলো, নইলে থুব-খু-উ-ব চেঁচিয়ে কাঁদব বল্‌ছি—অ্যা—অ্যা—অ্যা—" ব'লে ঝিনুক ছোট মুখখানি যতদূর সম্ভব বড় হাঁ ক'রে দেখাতে শুরু করে কান্নার পূর্বাভাসের স্বরূপ।

মৃন্ময় ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন—"আরে আরে থাম্‌ পাগ্‌লী! তোকেই ত আমি ভালোবাসি—সব চেয়ে—সব্বার চেয়ে!"

উদ্যত অশ্রুর ধারাকে শিশুমন যত সহজে অস্বীকার করতে পারে তত সহজে বোধ করি বড়রা পারে না—ঝিনুকের চোখের জল তখনও ঝল-মল করছে কিন্তু ওর স্বল্প কয়টি দাঁতের ফাঁক দিয়ে যেন প্রথম প্রত্যূষের অরুণোদয়ের হাসি উছ্‌লে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে ঝিনুকের পিতা ছাড়া আরও একটি মানুষ দেখ্‌ছিল ঝিনুকের এই বিস্ময়কর ভাবান্তর,—সে ওই রাজেন্দ্রাণী।

রাজেন্দ্রাণী একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডাকল—"এসো খুকুমণি, শোন আমার কাছে এসো!"

মৃন্ময় বল্‌লেন—"যাও তো মা মন্!"

—"না আমি যাই মাসিমাকে বলি গিয়ে যে, তুমি মাকেও না মাসিমাকেও না—আমাকেই শুধু ভালোবাসো!"

ব'লে ঝিনুক ঘাড় নীচু ক'রে চলে গেল, ঘাড় তুল্‌লে পাছে রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়, এই ভয়েই বেচারী গেল।

রাজেন্দ্রাণীর উৎসুক দৃষ্টি ঝিনুকের পিছু পিছু অনুসরণ ক'রে চলেছিল সহসা সেই নেতাটির কথায় বাধা পেল, তিনি বল্‌লেন—"শুনেছি তুমি বিয়ে থা ক'রে সংসারী হয়েছ?"

—"বিয়ে ত আমার অনেকবারই হ'ল, কিন্তু সংসার আর করতে পারলাম কই! ওসব শুনে কি লাভ বলুন। আমি ত চিরকালই আপনাদের পায়ের ছাপ দেখে দেখে কাটালাম।"

মৃন্ময় চাপা গলায় বল্‌লেন—"রজনী, একটু সমঝে কথা বলো। এখানে অনেক অল্পবয়সী ছেলে ছোক্‌রা রয়েছে।"

নেতাটি বিদায় নিলেন, তাঁর কোথায় একটা জরুরী সভা রয়েছে—অতএব আর ত বসতে পারেন না তিনি।

ক্রমশঃ হলঘরখানার হাবেভাবে মনে হ'তে লাগল আজকের এই উৎসব অনুষ্ঠানের সত্যকার প্রাণকেন্দ্র রাজেন্দ্রাণী। মৃন্ময় দালালের জন্মদিন নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না—শুধু যা উপহারগুলো তাঁর হাতে দিচ্ছে নিয়ম রক্ষার জন্য। কেউ না কেউ উঠে এসে দুটো কথা বলে যাচ্ছে রাজেন্দ্রাণীকে, কেউ বা দূর থেকে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, দীর্ঘতর সুযোগের প্রত্যাশায় ধৈর্যের ঘুড়ির সুতো ছেড়ে চলছে আস্তে আস্তে।

ঝিণুক আবার ফিরে এল। এবার হাসিতে খুশিতে ঝলমল্ করছে ঝিণুক। দূর থেকে তাকে আসতে দেখে রাজেন্দ্রাণী যেন নিজেকে প্রস্তুত করে রাখে—এবারে ঝিণুককে কাছে টানবেই ও। ঝিণুক তার বাবার কাছে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই রাজেন্দ্রাণী বাঁ হাতখানি বাড়িয়ে সতৃষ্ণ দৃষ্টি প্রসারিত করে বললে—"আমি তোমার বড় মাসিমা হই, এসো তোমার পুতুল দেখো।"

ঝিণুক অপাঙ্গে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে পিতার পিঠের দিকে আশ্রয় নিল। ওর ছোট্ট হৃদয়টুকু আজকের এই উৎসবের সমারোহে পিতাকে নিতান্ত একলা থাকতে দিতে ভরসা পাচ্ছে না—তাই একটা-না-একটা কিছু অছিলায় পিতার কাছেও হাজির হচ্ছে। ওর আশঙ্কা এতসব লোক এসেছে, এরা সবাই বুঝি ওর বাবাকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। বিশেষ ক'রে এই অপরিচিতা মহিলাটিকে ঝিণুক কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না। রাজেন্দ্রাণী যতই একটি হাত বাড়িয়ে ঝিণুককে ধরতে চায়, ঝিণুক ততই পাশ কাটায়। রাজেন্দ্রাণীর অনুরোধ, অনুনয়, খেলনার প্রলোভন কিছুতেই ঝিণুকের সংকল্প টলে না। ওর এই বিরূপতা যেন রাজেন্দ্রাণীর মনকে দুর্নিবার ক'রে তোলে—ঝিণুককে জোর ক'রে কাছে টানবার প্রয়াস ওর আরও বেড়ে যায়।

মৃন্ময় দালাল দুদণ্ড বসবার অবসর পান না। 'সামান্য' জলযোগের বিপুল আয়োজন কতদূর অগ্রসর হয়েছে দেখবার জন্য তিনি একবার অন্দর মহলে প্রবেশ করতেই তাঁর শ্যালিকা চোখ নাচিয়ে বললে—"জামাইবাবু যে আমাকে আজ দেখতেই পাচ্ছেন না—"

ঝিন্তক পিতার পক্ষ নিয়ে বললে—"মাসিমণি তুমি ভারি দুষ্টু, বাবা তোমার সঙ্গে কতাই কইবে না,—আমাকে রাগাচ্ছিলে যেমন।"

মাসিমণি মৃদু ধমক দিয়ে কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বললে—"থাম দেখি খুকী! বলে আমিই পাত্তা পাচ্ছিনে, আর তুই ওই হাটে ছুঁচ বেচতে গিয়েছিস্!"

মৃন্ময় বললেন—"আঃ কি হচ্ছে রাধু! বাচ্চা মেয়েটাকে তুই পাকিয়ে তবে ছাড়বি! বলি, সারারাত একগাদা লোক সাজিয়ে বসে থাকবো নাকি রে—এদিকে তোদের উদ্‌যোগ যুগ্যি হ'লো?"

—"আহা, সাতবার খবর পাঠিয়ে নড়ানোই যায় না আপনাকে ওই চাঁদ মুখের সামনে থেকে—আমি কতবার পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মারলুম বলে—"

মৃন্ময় হেসে উঠলেন—"ও ঘরে সব সাপ না বাঘ রয়েছে, গিয়ে ডাকতে কি হচ্ছিল?"

—"বাবাঃ, যা সব জেল্লার বহর ওখেনে, দাঁড়াব এমন চটক কোথায় পাবো?" তারপর মৃন্ময়ের মুখের পানে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে দেখল তাঁর সপ্তদশী শ্যালিকা। "আচ্ছা জামাইবাবু ওই উর্বশীটি কে?"

মৃন্ময় বললেন—"ওই ত উর্বশী রে!"

—"তা ত বুঝেছি। কিন্তু কি নাম ধরেন তিনি এই কলিযুগে?"

—"নাম? যে যা ব'লে ডাকে, এই যেমন তুমি ডাকতে গেলে ডাকিনী বলবে—আমি বলি রাজেন্দ্রাণী।"

—"আমার বয়েই গ্যাছে!" তারপর মুহূর্তকাল নীরব থেকে বললে রাধু—"ছোট্‌দি বলছিল ওই তোমার প্রাণের পাখী রজনী—সত্যি?"

—"তোমার ছোট্‌দি ত কোনোদিন চোখে ছাখেনি রজনীকে!"

—"চোখে না-ই দেখুক, আপনার আঁকা সব ছবিতেই ত ওর মুখের আদল রয়েছে, একথা বুঝব-না এমন ঘেসো ছাগল নই আমরা কেউ!"

ছোট্‌দি অর্থাৎ মৃন্ময়ের স্ত্রী হাজির হ'লেন,—"রজনীকে নেমন্তন্ন ক'রেছ বেশ ভালোই হয়েছে, কিন্তু আমার কাছে সেটা লুকোবার দরকার ছিল না।"

মৃন্ময়কে কোনো জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই তাঁর স্ত্রী অন্তর্ধান করলেন। তাঁর কি দাঁড়িয়ে সওয়াল-জবাবের ফুরসৎ আছে?

অসহায় মৃন্ময় একবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে আড়ষ্টতা কাটাবার চেষ্টা ক'রে মালিকাকে বল্লেন—"সে যাক, এখন বলো দেখি এঁদের বসবার দেরী কত?"

—"আর দেরী কি, এবার ডাকলেই হয়?"

—"তাহলে বসিয়ে দিই, কি বলো?"

বলে মৃন্ময় বাইরের হলে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখেই জনৈকা অভিনেত্রী ইশারায় কাছে ডেকে জানালো—"আমি এবারে উঠি। বড্ড রাত হয়ে যাচ্ছে।"

—"সে কি কথা। তুমি চলে গেলে আসর কানা হয়ে যাবে যে রম্ভা।"

রম্ভার মনে কোথাও মেঘ জমেছিল, এই ক'টি কথার স্পর্শে সেটা দ্রব হয়ে ঝরে পড়ল—"আহা, ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি। আজকের আসরে আমরা সবাই জানাকী হয়ে গেছি, তা আপনি খুঁচিয়ে না বললেও চল্‌ত।"

মৃন্ময় বল্‌লেন—"তুমিও একথা বল্‌ছ রম্ভা!"

—"যা, সত্যি তা সত্যিই, আমার বলাতে কিছু এসে যায় না, মিঃ লাল।"

রম্ভার এ কথায় মৃন্ময় মনে মনে খুশিতে যেন উপ্‌চে ওঠেন। বলেন—'রাজেন্দ্রাণীর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই? চলো পরিচয় করিয়ে দিই।"

রম্ভা দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বল্‌লে—"দূর হতে করি নমস্কার। ওঁকে আর আমি চিনি না? কী ক্যাওলাই করছেন নাগাড়ে বিশ বছর ধরে। আমরা বয়সে নাবালিকা ছিলুম যখন তখনই ত ওঁর কেলেঙ্কারীতে কান পাতা যেতো না—ওঁকে নিয়ে কি নাচানাচিই করেছে সব লেখক, শিল্পী, নেতারা! তার ফলও দিয়েছেন ভগবান!"

মৃন্ময় মনে মনে হাসছেন, বহুপরিচর্যায় নিপুণা রম্ভার মুখে এসব কথা শুনে তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে কয়েকটি কথাও এসেছিল—কিন্তু আজ রম্ভা তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রিতা, তা ছাড়া রম্ভাই এখন তাঁর সর্বোত্তম 'মডেল', তাই শুধু বল্‌লেন —"তোমার মুখে 'ভগবান' কথাটা ভারি মিষ্টি শোনালো রম্ভা!"

রম্ভার গৌরবর্ণ মুখ পাউডারের প্রলেপ—প্রভাব ছাপিয়ে রাঙা হয়ে উঠল, ও বল্‌লে—"এই সব দেখ্‌লে ভগবানকে মানতে ভালো লাগে। আচ্ছা, তাহলে এখনকার মত—"

ব্যস্ত হয়ে মৃন্ময় বল্লেন—"না, না, সে কিছুতেই হতে পারে না। তুমি চলে গেলে বুঝব যে রাগ ক'রেই গেছো। ছাখো রত্না তোমাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ আর হাতের মুঠোতে বর্তমান, আর আমাদের বর্তমানের মধ্যে অতীত এসে ভাগ বসাচ্ছে, সম্মুখে ক্লান্তি, অবসাদ আর দীর্ঘশ্বাস, তোমরা কেন আমাদের সঙ্গে লড়াই করবে? করুণার পাত্র এগিয়ে দাও, মজা দেখতে পাবে।"

—"আপনার একার কথা বলতে চান ত মেনে নেবো। কিন্তু 'আমরা' বলে যাঁকে আপনার দোসর টানতে চাচ্ছেন তাঁর চতুর্থ স্বামীর বয়স খুব বেশী হয় তো বাইশ হবে, তা জানেন? She is an acute case of chronic youth—ওঁর যৌবন অক্ষুণ্ণ, কিন্তু তাই ব'লে বাইশ বছরের ছেলেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা! Just imagine! শুনেছি এককালে উনি আপনারও শিল্পরসের জীবনাবেগ ছিলেন!"

মৃন্ময় জবাব দিলেন একটু সংক্ষিপ্ত হাসির মধ্য দিয়ে।

তারপর ঘোষণা করলেন—"আপনারা অনুগ্রহ ক'রে ভেতরে চলুন—সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করতে হবে।"

পরমুহূর্তে সামরিক নিয়মানুগ সৈনিকের মতই সকলে উঠে দাঁড়ালেন ভেতরে যাবার জন্য। রত্না কিন্তু উঠ্‌ল না, আরও জন তিনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী বসে রইল, তারা বল্লে—"আমাদের যদি একটু সরবৎ পাঠিয়ে দ্যান, তাহলেই চল্‌বে।"

মৃন্ময় বল্লেন—"আচ্ছা, আপনাদেরটা এখানেই দিচ্ছি পাঠিয়ে।"

এই বিচ্ছিন্ন দলে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজেন্দ্রাণীকে নিয়ে।

রাজেন্দ্রাণী বড্ড একা পড়ে গেল। ও ভেতরে খেতে যায়নি। বহু পুরাতন একটা সংস্কার আছে ওর। কারুর সামনে কোন দিন ওকে ভোজন করতে দেখা যায়নি। ও ব'লে থাকে—"কথায় বলে আহার—দুটোই লোকচক্ষুর অগোচরে হওয়া ভালো। খাওয়াটা শরীরের পক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু খাবার সময়ে অন্যের মুখের পানে চেয়ে দেখেছি ত—সকলেই দেখতে একরকম হয়ে যায়। মা গো, আমিও ওইরকম দেখ্‌তে হয়ে যাবো তো!" বড় বড়

র্টিতেও কোনদিন পানীয় ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেনি রাজেন্দ্রাণী। মৃন্ময় সব জানেন, সেইজন্য ওকে মোটেই পীড়ন করলেন না।

রাজেন্দ্রাণীর চোখের সামনে ঝিণুকের চঞ্চল লঘুগতি—চোখ পেরিয়ে ওর নের মধ্যে ঝিণুকের চলাফেরা শুরু হয়ে গেছে। হয়ত এই মুহূর্তেই ঝিণুক লঘরে নেই, তবু রাজেন্দ্রাণী দেখ্‌তে পায় ঝিণুককে, তার মনে হয় এখনই ঝি ছোট্ট মেয়েটি তাকে বলবে এসে—"এই ত আমি এলুম—তোমার কাছে!"

ওদিকে রম্ভার চোখে তীব্র কটাক্ষ, চাপা গলায় পার্শ্ববর্তীকে বল্‌ছে—"কী হোয়া দেখেছ! ও যে কি ক'রে সমাজে আবার মুখ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে বলেও গা রী-রী ক'রে ওঠে!"

পার্শ্ববর্তী যুবকটি বলে—"কেন, কি হয়েছে—তুমি তখন থেকে অমন টাট্টু ঘোড়ার মত টগ্‌বগ্ করছ কেন?"

—"মেয়ে জাতের ওপর পুরুষের ঘেন্না হতেই পারে—এসব নমুনা দেখ্‌লে আমাদেরও লজ্জা করে—"

—"আহা, অত ইয়ের কারণটা কি রম্ভা স্পষ্ট বলো না—"

—"ওই—দেখছ না!"

—"হ্যাঁ, উনি যখন এসেছেন তখন থেকেই ত দেখ্‌ছি আর দেখ্‌ছিই। মন রূপের বাঁধুনী দেখা যায় না।"

রম্ভা ঘাড় ঘুরিয়ে বল্‌লে—"ইস্! দেখো—! সমুদ্রের জল মাপতে যেয়ো অপরেশ বাবু, নুনের পুতুলের দশা হবে।"

—"তুমি যা-ই বলো, She is a paragon of beauty!"

—"আমি কিছু বলতে চাই নে। শুধু বল্‌ছি ওঁর বয়স যদি একদিনও হয় বে উনি তেতাল্লিশ পেরিয়ে গেছেন।"

—"আশ্চর্য! অথচ দেখ্‌লে মনে হয় যেন, এই রূপই চিরকালের কবিরা রনা করতে চেয়েছেন—জীবনের বাস্তবে এমন কাব্যরূপ—!"

রম্ভা এবারে যেন ভুলে যায় যে ওর আশপাশে অন্য কোনো প্রাণী বিদ্যমান, সজোরে বলে উঠ্‌ল—"কিন্তু ওর একটা হাত নেই, দেখেছ! ওর ব্যভিচারের

শাস্তি দিতে গিয়ে, গুলী মেরে ওর ওই বিষভরা বুকজোড়ার একটি উড়িয়ে দিয়েছিল ওর প্রথম পক্ষের স্বামী!"

কথাগুলো রীতিমত জোরালো গলাতেই রম্ভা বলেছিল—ওর আশপাশের সকলেই চমকে উঠ্‌লে সেকথা শুনে। আর একটি মেয়ে রম্ভার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে—"যাঃ, কী হচ্ছে রম্ভা।" নিজের অসংযত উক্তির জন্য রম্ভা নিজেও লজ্জিত হ'ল।

পাশের ঘরে মৃন্ময় বাবু অতিথিদের খাওয়াচ্ছিলেন। রম্ভার কথাগুলো তাঁর কানেও প্রবেশ করেছে। তিনি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেরিয়ে এসে দেখ্‌লেন, রাজেন্দ্রাণী চুপ ক'রে বসে আছে। ওর মুখেচোখে নিবিড় তন্ময়তা। মৃন্ময় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, কি যে বলা উচিত ঠিক ভেবে পাচ্ছেন না তিনি।

রাজেন্দ্রাণী কিছুই শুনতে পায় নি, এমন কি মৃন্ময়কে দেখ্‌তেও পায় নি। ওর চোখের সামনে খেলে বেড়াচ্ছে ঝিনুক—ঝিনুক হাসছে আর নাচ্‌ছে আর—গাইছে।

মৃন্ময় বাবুর পিছু পিছু ঝিনুকও দৌড়ে এসেছে। মৃন্ময়কে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঝিনুক প্রশ্ন করে—"তোমার কি হয়েছে বাবা?"

রাজেন্দ্রাণী চম্‌কে উঠে অশ্রুভারাক্রান্ত আয়ত দুটি চোখ তুলে ঝিনুকের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে—"আমাকে বলছ?"

ঝিনুক প্রবলবেগে ওর ঝাঁকড়া চুলের গুচ্ছ দুলিয়ে ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিল—"না, না, আপনাকে বলি নি—"পরমুহূর্তে পিতার উড়ুনীর প্রান্ত আকর্ষণ ক'রে বললে ঝিনুক—"বলো না বাবা তোমার কেন রাগ হ'ল?"

রাজেন্দ্রাণী পুনরায় ওর একমাত্র হাতখানি ঝিনুককে ধরবার জন্য ব্যাকুলভাবে বাড়িয়ে দিল।

রম্ভা তার সঙ্গিনীর গায়ে ঠেস দিয়ে চাপা গলায় বল্‌লে—"ঢঙ দেখেছিস!"

মৃন্ময় বাবু ঝিনুককে ধমক দিলেন—"তুমি বড্ড অবাধ্য মেয়ে হয়েছ ঝুনি। উনি তখন থেকে তোমায় ডাকছেন, তবু একবার যাচ্ছ না কেন?"

অভিমানে ঝিনুকের কচি মুখখানা থম্‌থমে হয়ে উঠ্‌ল, তারপরই ও কেঁদে

ব'ললে—"আমার ইচ্ছে করছে না যে"—ওর ইচ্ছের ওপর নিজের কোনো হাত নেই—এমনই অসহায়ভাবে কথাগুলো বললে ঝিনুক।

রাজেন্দ্রাণী অনুযোগ করলে মৃন্ময়ের রুষ্ট আচরণে—"ওইটুকু একরত্তি মেয়েকে অমন ক'রে কেউ বকতে পারে? এই তুমি শিল্পী?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল মৃন্ময়ের বক্ষ মথিত ক'রে।

রাজেন্দ্রাণী আপন মনেই বলে—"ওর কোনো দোষ নেই, এ ত আমারই অক্ষমতা! যদি আজকে আমার দুটো হাত থাকত তাহলে ওকে কখন জড়িয়ে ধরতাম—কিছুতেই পালাতে পারত না!"

কথাগুলো রাজেন্দ্রাণীর মুখে খুবই অস্বাভাবিক শোনায়—। পাছে কেউ ধরতে পারে ওর ডান হাতখানির অনস্তিত্ব সেই আশঙ্কায় রাজেন্দ্রাণী অনেক রকম কায়দা ক'রে চলে। কোথায় যেন এরোপ্লেনে ক'রে ও উড়ে গিয়েছিল বিদেশে, একখানা নকল হাত তৈরী করিয়ে আনবার জন্য—এ খবর মৃন্ময় অনেক আগেই পেয়েছেন বন্যার মত কোনো মেয়ের মারফতে অযাচিত ভাবে। রাজেন্দ্রাণীকে দেখ্‌লে কেউ বুঝতেই পারে না যে ওর একটি হাত নেই, নেই একটি মধুরসের সুধাকলস। পোশাক আশাকের নৈপুণ্যে এটুকু ঢাকতে পারে রাজেন্দ্রাণী। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ওর মুখ থেকে এই কথাগুলো যেন অন্য এক সত্তাকে প্রকাশ ক'রে দিল।

বেদনা—হতাশা—আক্ষেপ, একসঙ্গে বেজে উঠ্‌ল ওর কণ্ঠে!

ঝিনুক চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে চলে গেল। রাজেন্দ্রাণী বললে—"ওকে একটু আদর করো, কেন কষ্ট দিচ্ছ?"

মৃন্ময় বল্‌লেন—"না, না, অত আদর দিলে পীরেদের রাজহংসীর মত, প্যাঁক্‌-প্যাঁক্ করবে বয়েস-কালে।"

—"আমার একটা কথা অন্ততঃ আজকের মত শোনো!"

মৃন্ময় বল্‌লেন—"আচ্ছা, আচ্ছা!"

ঝিনুককে আদর করতে ও যেন কান্নায় আরও ভেঙে পড়ল। ও কান্নায় ফুলে ফুলে আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌ল রাজেন্দ্রাণীর চোখের সামনে। অপূর্ব তৃপ্তির আমেজে রাজেন্দ্রাণীর মনটা ভরপুর হয়ে যায়। ঝিনুকের কান্নার সঙ্গে

সঙ্গে যেন তার অন্তরের সঞ্চিত বেদনাভরা অশ্রুপুঞ্জ ঝরে পড়ছে—বেদনাবরার ঝর্ণায় স্নান করতে পেয়ে রাজেন্দ্রাণী ধন্য হয়ে গেল।

ঝিন্টুকের কান্না থামল। রাজেন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল—"একটু বাইরে যেতে পারবে আমার সঙ্গে?" তারপর ঝিন্টুককে সম্বোধন করে মৃদুস্বরে বললে রাজেন্দ্রাণী—"তুমি যাও তো ভেতরে। মাসিমার কাছে গিয়ে বলো আমায় একটা পান দিতে—"

এবারেও ঝিন্টুক ঘাড় বাঁকিয়ে প্রতিবাদ জানাল—মুখে কোনো কথা বল্‌লে না, তবে তার আচরণে নড়বার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না।

রাজেন্দ্রাণী বল্‌লে—"তাহলে এসো আমার সঙ্গে তোমায় গাড়ি ক'রে নিয়ে যাই!"

এ প্রস্তাবে ঝিন্টুক এক দৌড়ে উধাও হয়ে গেল।

মৃন্ময় বল্‌লে—"পাগ্‌লী একটা!" তারপর রাজেন্দ্রাণীকে এগিয়ে দেবার জন্য ওর সঙ্গে চল্‌লেন। চল্‌তে চল্‌তে আপন মনেই বল্‌লেন—"কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি নে তোমাকে দেখে ও এমন বেঁকে বস্‌ল কেন? যাকে দেখে সবাই চঞ্চল হ'য়ে থাকে তার ওপর এই বিরূপতার ঠিক কারণটা কি!"

রাজেন্দ্রাণী বল্‌লে—"ও বুঝে নিয়েছে যে, ওর বাবাকে আমি কেড়ে নিতে পারি।"

—"তাই নাকি?"

—"ঠিক তাই। আমি যদি তোমায় আজও অধিকার করতে চাই তাহলে কেউ বাঁচাতে পারবে না—যদি পারে ত ওই ঝিন্টুকই পারে।" নিজের মনের উত্তেজনাকে দমন করে নিয়ে রাজেন্দ্রাণী বল্‌লে—"কিন্তু এসব কথা বল্‌তে আসি নি। তোমার জন্মদিনে আমায় বাদ দিয়ে উৎসব করবে তুমি সে জন্যেও আমার দুঃখ নেই—"

—"তবে কি জন্যে এলে দশবছর পরে?"

—"এসেছিলাম, মনটা একটু হাল্‌কা ক'রে নেবার আশায়। একটা আশ্চর্য যোগাযোগ দেখে ছুটে এসেছিলাম—"

—"কি যোগাযোগ ?"

—"সত্যিই কি আজ তোমার জন্মদিন ?"

—"বাঃ, এত লোকে ত সেই উপলক্ষ্যেই এখানে এসেছে—আর কেউ ত এমন প্রশ্ন করেনি রজনী।

—"আচ্ছা তোমার কি মনে পড়ে সেদিনের কথা ?"

মৃন্ময় একবার চোখ বুজে নিজের ভেতর পানে দেখে নিলেন, তারপর, একটু হেসে বল্লেন—"না, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমার জন্ম কবে হয়েছিল, সে তারিখ, বার, বৎসর কিছুই আমি জানিনে। গরীবের ঘরের অবাঞ্ছিত ছেলে, আমার জন্মের মধ্যে উৎসব উল্লাসের কিছুই ছিল না—সেই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে।"

—"তবে আমি ঠিকই ধরেছি—"

—"কি ধরেছ ? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মৃন্ময় বল্লেন।

—"তোমার মনে পড়ছে না সেদিনের সন্ধ্যার কথা ?"

মৃন্ময় যেন কোনো অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান এমনই অসহিষ্ণু-ভাবে জবাব দেন—"ওসব কথা আলোচনায় আজ কোনো লাভ নেই।" মুখের ওপর যত সহজে আলোচনাটা মুলতুবী করলেন মৃন্ময় দালাল মনের মধ্যে ঠিক যেন ততই জোরালো ভাবে আলোড়ন শুরু হয়ে গেল তাঁর। তিনি দেখ্‌লেন ...চোখের সামনে রাজেন্দ্রাণীর নগ্ন দেহ। সেদিন শুরু হয়েছিল 'ভেনাস' আঁকা। মৃন্ময় আঁকবেন রাজেন্দ্রাণীকে সমুদ্রোত্থিতা সম্মোহিনী ভেনাস রূপে। স্টুডিওতে দুজনে ছাড়া আর কেউ ছিল না। মৃন্ময়ের তুলি সেদিন কাঁপছিল, ক্যান্‌ভাসের ওপর আঁকা আপেলের রঙে গাঢ় লালের মাত্রা বেশি হয়ে যাচ্ছিল বই কি। তবু মৃন্ময় নিজেকে দমন করতে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করছিলেন। আঁকার কাজ খুবই ধীর মন্থরে চল্‌ছিল। সহসা দরজায় ধাক্কা দিল কে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রলয় ঘটে গেল। রাজেন্দ্রাণীর স্বামী ভিতরে ঢুকে সর্বাগ্রে মৃন্ময়ের ক্যান্‌ভাসে পদাঘাত করে ইজেল, প্যালেট তচ্‌নচ করে দিল, তারপর রজনীর আলগা আবরণটা এক ঝট্‌কায় খুলে ফেলে দিয়ে হঠাৎ পকেট থেকে রিভলবার বার করে গুলী ছুঁড়ল।...এই পর্যন্ত মনে

পড়তেই মৃন্ময় চমকে শিউরে উঠলেন। চোখ দুটো তাঁর নিজের অজান্তে বুজে যায়। শুধু স্মরণেই আজ মৃন্ময় শিউরে উঠলেন, অথচ যে দিন এ ঘটনা বাস্তবে ঘটেছিল সেদিন মৃন্ময় পাথরের মতই নিথর হয়ে গিয়েছিলেন আহত অবস্থায় রাজেন্দ্রাণীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ওর স্বামী চলে যাওয়ার পর থেকে মৃন্ময় অনেকবার চেষ্টা ক'রেছেন কিন্তু পারেন নি নিজেকে সম্বরণ করতে—রাজেন্দ্রাণীর বিকলবিকৃত চেহারার সামনে দাঁড়াবার মত কঠিন শাস্তি আর কিছু নেই। তিনি তারপর এক মনে অজস্র ছবি এঁকে চলেছেন, খ্যাতি কুড়িয়েছেন, মনকে শামুকের মত নিজের কোটরে গুটিয়ে ফেলেছেন।

রাজেন্দ্রাণী বললেন—"আশ্চর্য ব্যাপার! দশ বছর আগে আজকের এই তারিখেই তোমার ভেনাসকে চুরমার ক'রে দিয়ে গিয়েছিল সেই দুঃশাসন তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে এলাম—আজই কি তোমার জন্মদিন?"

মৃন্ময় বললেন—"না, না, না, সে হতেই পারে না। আমি সে কথা ভুলে গেছি—ভুলতে চাই।"

—"পারো নি মৃন্ময়। তুমি সেদিনের কথা ভুলতে পারো না! আর আমি তারপর থেকে কতবার বাঁচবার চেষ্টা করেছি কিন্তু আর বাঁচতে পারি নি।"

—"অসম্ভব—এ হতেই পারে না।"

—"এ নিয়ে তর্ক করবার মত মনের অবস্থা আমার নেই।"

—"তবে যে শুনি তুমি বাইশ বছরের ছেলেকে বিয়ে করেছ।"

—"সেইখানেই ত আমার ভাগ্যের পরিহাস। আমি চেয়েছিলাম একটি কিশোরকে মায়ের চোখ দিয়ে দেখব, তাকে মানুষ করব। ভবিষ্যতে সে-ই আমার ছেলে এই পরিচয় পৃথিবীতে থাকবে—আমার টাকাকড়ি নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলবে।···কিন্তু চার বছর পরে দেখি সে আমায় যে আলিঙ্গন করে তার নিবিড়তায় পুরুষের কামনাই প্রবল। কিন্তু এ কথা ত কেউ বিশ্বাস করে না।"

আলো আঁধারের মধ্যে রাজেন্দ্রাণীর দুটি চোখই যেন পাথরের মত নিস্তব্ধ দেখাচ্ছে—ও বলছে—"একদিন আমি শিল্পকে যে প্রাণমন দিয়ে ভালোবেসে ছিলাম, যে আকুলতা দিয়ে দেশের শিল্পীমনে প্রেরণা এনে দেবার ব্র

নিয়েছিলাম, . সেই যৌবনের জোয়ারে মাতৃত্বের সম্ভাবনাকে উপড়ে ফেলেছি ব'লেই বুঝি এমনি ক'রে পৃথিবী প্রতিশোধ নিচ্ছে।" আবেগের তাড়নায় রাজেন্দ্রাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে।

মৃন্ময় আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

রাজেন্দ্রাণী আবার শুরু করল—"ওরা আমায় আজও সেই ভোগ লালসা মাখিয়ে দেখ্‌তে চায়। কিন্তু আমি জানি ওরা খোসার খবরই রাখে—" মৃন্ময়ের মুখের পানে তাকিয়ে রাজেন্দ্রাণীর সন্দেহ হয়, বুঝি মৃন্ময়ও ওই ওদের দলে, "কিন্তু মৃন্ময় তুমি আমার মন ছুঁয়েছিলে। তোমার কাছে একটা অনুরোধ করে যাই—"

—"বলো—"

—"হয়ত এটা আমার পাগ্‌লামি। দিনের আলোয় ভাবতে গেলে আমি নিজেই হয়ত হেসে উঠে নিজেকে ঠাণ্ডা করব। কিন্তু তবু তুমি শোনো—আমার একখানা ছবি এঁকে দেবে?"

—"বেশ ত।"

—"না, আগে শোনো, সব কথা বলতে দাও আমায়। আমার ছবি আঁকবে —ছবিতে কিন্তু আমার দুটো হাতই থাকে যেন। দেখো, নকল হাতের মত সে হাত অকর্মণ্য না হয়ে যায়। আমাকে আঁকবে তুমি মায়ের রূপে। আমি যেন দু-হাত দিয়ে আদর করেছি ঝিন্টুকে। ঝিণ্টু সে আদরে খুব আনন্দ পায় যেন।" রাজেন্দ্রাণী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলে—"পারবে—সে ছবি এঁকে দিতে পারবে?" পরক্ষণে নিজের মনেই বললে ও—"না, সে হয় না। যা বাস্তবে ঘটে না, তা তুমি কি ক'রে কল্পনা করবে?"

মৃন্ময় দালাল দৃঢ়কণ্ঠে বললে—"খুব পারব। কিন্তু দাম দিতে পারবে তার?"

রাজেন্দ্রাণী মৃদু হেসে জবাব দিল—"ছবি পছন্দ হ'লে ত দাম।"

—"যদি পছন্দ হয় তখন?"

—"যা চাইবে তুমি তাই দেবো।"

—"আমি কাজে হাত দেবার আগে দামদস্তুর করে নিই—"

—"খাঁটি শিল্পীর কাজই করো। তা, কত চাই?"

—"আগে বুঝে দ্যাখো—দিতে পারবে কি না। আমার দাবি উচ্চারণ

ইবার পর আর প্রত্যাহার হয় না। যদি বলো দাম দিতে পারবে না, তবে অমনিই দেবো উপহার, নইলে যা চাইব তাই দেবে কথা দাও—"

—"অচ্ছা বেশ দেবো তাই—"

—"বাইশ বছরের ওই ছেলেটিকে মুক্তি দিতে হবে।"

চমকে উঠল রাজেন্দ্রাণী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে আস্তে আস্তে—"কিন্তু মায়ের প্রাণ কি আমার নয়? ওকে কোথায় ফেলে দেবো? ও যে অসহায়।"

মৃন্ময় হেসে উঠলেন—তাঁর হাসিতে ব্যঙ্গ আর স্নেহের অসংখ্য বাণ ছুঁড়ে দিয়েছিল যেন কে।

রাজেন্দ্রাণী জলে উঠে বললে, "মিথ্যে কথা। তোমার ওই অপবাদ মিথ্যে, বুঝলে মৃন্ময়। তুমি কি তোমার ঝিনুককে ছুড়ে ফেলে দিতে পারো?"

—"তর্ক দিয়ে এর মীমাংসা হয় না রজনী।"

—"কিন্তু ঈর্ষার চেয়ে বড় পাপ আর কিছু নেই জেনো মৃন্ময়।"

এমন সময়ে ঝিনুক ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাইরে এসে চীৎকার ক'রে ডাকল—"বাবা! বাবা! তুমি কোথায়! কোথায় তুমি!"

"এই যে, যাই মা মণি"—সাড়া দিলেন মৃন্ময়। তারপর রাজেন্দ্রাণীর বাঁ-হাতখানা স্পর্শ ক'রে বললেন—"দেবো, তোমায় ও ছবি এঁকে দেবো।"

ভেতরে ঢুকতেই সকলে যেন মৃন্ময় দালালের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগ্‌ল। তিনি এসব দৃষ্টির, এই সব কানাকানির কোনো কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না। তাঁর চোখের সাম্‌নে খেলে বেড়াচ্ছে ঝিনুক। আর রাজেন্দ্রাণী অসহায় দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে ঝিনুককে একটিমাত্র হাতের বেড় দিয়ে বাঁধবার ব্যর্থ-প্রয়াসে বিপর্যস্ত হচ্ছে। ঝিনুকের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাজেন্দ্রাণী পৃথিবীর আর সব কিছু অস্বীকার করতে চাইছে কি? তাঁর ভাবনা হচ্ছে, ছবি আঁকবার সময়ে কি তিনি হাত জুড়ে দিতে পারবেন রাজেন্দ্রাণীর অঙ্গে—যে হাতখানি নেই তা কি সত্যই আঁকা যায়—এঁকে সত্য করা সম্ভব হয়! পাকা শিল্পী মৃন্ময় দালালের এ-কী অলীক সংশয়।

'বন্ধন'

অবশেষে মঙ্গলার বুঝি বা একটা সুরাহা হ'ল।

আড়ীপুর থেকে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন 'ডিপুটী' বাবুর পিসিমা। মঙ্গলা সেখানেই চাকরী করবে, খাওয়া-পরা বারোটাকা মাইনে। পিসিমার বাড়িতে কাজের তেমন ঝক্কি নেই, লোকজন কম, ওঁরা মানুষও খুব ভালো। 'ডিপুটী' বাবুর বৌ মঙ্গলাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন,—এল মঙ্গলা, ওর দিদি এল বোনকে বিদায় দিতে। সাশ্রু নয়নে দুই বোন পরস্পরের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকে—দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার কথা দু'জনেরই মনে নেই, আর চোখের জলও ঝরছে ত ঝরছেই, থামতে জানে না।

ডেপুটী বাবুর বৌ দুই বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—"কোনো ভাবনা নেই মঙ্গলা। তোমার যখন মন কেমন করবে তখনই এক বেলার ছুটি নিয়ে চলে আসবে দিদির কাছে। আর তা ছাড়া আমাদের ত যাওয়া-আসার কামাই নেই, খোঁজ খবর ত রোজই পাবে।"

বাড়ির সরকার এসেছে মঙ্গলাকে নিতে। সে-ও দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ চুপ ক'রে। এবারে সে বললে, "আর বেশি বেলা ক'রে কাজ নেই বাছা, চলো।" তারপর মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে বললে—"তোমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়েছ? নাও এখন চলো।"

একবস্ত্রেই মঙ্গলা এসেছিল। করুণ দৃষ্টিতে একবার দিদির দিকে এবং পরক্ষণে ডেপুটীবাবুর বৌ-এর দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করল। ব্যাপারটা অনুমান করতে ডেপুটীর স্ত্রী কনকের কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কনক একটু হেসে বললে, "দেখুন সরকার মশাই, পিসিমাকে বলবেন একখানা ছেড়া-খোঁড়া কাপড় যেন মঙ্গলাকে এখন পরতে দ্যান।"

সরকার বললে—"সে কি করে' হবে? ও বাড়িতে ত সবই ধুতি আর থান।"

মঙ্গলা ঘাড় হেঁট ক'রে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনিই রইল। কনক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লে,—"থান পরতে ত বিধবা মানুষের বাধা নেই।"

সরকারের চোখে-মুখে বিস্ময় সুপরিস্ফুট—"বিধবা? আমি বলি কি বুঝি কুমারী—আহা এই বয়েসে সব অন্ধকার।" বল্‌তে বল্‌তে পকেট থেকে পানের কৌটো বার ক'রে এক খিলি পান গালে ঠেসে দিয়ে বল্‌লেন সরকার মশাই—"আমি বলি কি মা, থান-টান পরে কাজ নেই; সে দেখতে বড় কষ্ট হয় আমার! তার চেয়ে একখানা শাড়ী নয় যাকে কিনে দিতে বল্‌ব, সাম্‌নের মাসের মাইনে থেকে কাটান্‌ দিলেই হবে। এই এখন যেমন শাড়ী পরে রয়েছে—"

কনক বল্‌লে—"সে যেমনটি পিসিমা বল্‌বেন তাই হবে। তাহলে মঙ্গলা, সাবধানে থেকো।"

মঙ্গলার দিদি বল্‌লে—"মাসের মধ্যে একআধবেলা ছুটি—"

সরকার বাধা দিল—"আহা সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই মা, এ ত আর বিদেশ বিভূঁই নয়।"

মঙ্গলা বিদায় নিল চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে। ওর দিদিও অনেক কাঁদল।...এরা ত আপন কেউ নয়, মঙ্গলার দিদি কয়েকদিন ঠিকে ঝিয়ের কাজ করেছে কনকের সংসারে, কিন্তু কনকও বিষণ্ণ নয়নে বসে ছিল কিছুক্ষণ।

মঙ্গলার দিদি কাঁদতে কাঁদতেই বলে—"বড় দুঃখী আমরা দিদিমণি, নইলে মায়ের পেটের বোনকে দুমুঠো ভাতের জন্যে পরের দোরে পাঠাই! মনটা কেমন হু হু করছে! আহা এই ত বয়েস, সোয়ামী গেল, পেটের শত্তুর একটা এসেছিল সেটাও গিয়েছে বাপের পিছু পিছু।"

কনক বল্‌লে, "দুঃখু ক'র না, আমার পিস্‌-শাশুড়ী তেমন মানুষ নন, মঙ্গলা যদি একটু সমঝে চলে তাহলে উনি নিজের মেয়ের মত রাখবেন। ওঁর ত দুই ছেলে, মেয়ে ত নেই—"

মঙ্গলার দিদি চোখ মুছল—"তুমি দিদিমণি গতজন্মে দেবতা ছিলে। এই ত এত লোকের বাড়ি কাজ করেছি, কিন্তু তোমার মতনটি আর কাউকে দেখলুম নি। নইলে কোথায় বয়গর আর কোথায় আলীপুর তোমার দয়া

ছাড়া এ আমরা কিছুতেই হদিস করতে পারতুম নি। আমাদের দাসও সেই কথাই বলে।” মঙ্গলার দিদি নিজের স্বামীকে দাস বলেই উল্লেখ করে থাকে।

কনক বল্‌লে—“তোমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছে ত?”

মঙ্গলার দিদি ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল—“ওমা, আমি যে উনুন থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়েই সাত তাড়াতাড়ি মুংলীকে দিতে এনু। ত্যাখো দিকি কাণ্ড!”

মঙ্গলার দিদি চলে গেল। কনকের পুরনো দাসী অম্বিকা দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই স-কলরবে বল্‌লে, “দেখ্‌লে ত গিন্নীমা, দরদ দেখ্‌লে? উনি ভাত নামিয়ে বোনকে বিদেয় করে গেলেন—দু-থাবা ফ্যানে-ফ্যানে ভাত প্রাণে ধরে খাইয়ে দিতে পারলি নে।”

“ওমা সত্যি ত, বেলা অনেক হয়েছে যে অম্বিকে মাসী—” কনক ঘর থেকে বল্‌লে, “তোমার কাচাকুচী হ'ল?”

“আমার কি চুপ ক'রে বসে বসে দরদ পাথ্‌লালে চলে মা? ওসব ওদের পোষায়। বলি, বোন্‌টাকে ভাসিয়ে দিয়ে এখন পা ছড়িয়ে কাঁদতে বস্‌ল। ক্যানে, দাস যা মাইনে পায় তাতে ওদের চলে না, নাকি? আর তাও বলি, একবারে একখানা ন্যাক্‌ড়া বল্‌তে একছোট্ সঙ্গে দিতে পারত না?” বল্‌তে বল্‌তে অম্বিকা বাসনের পাঁজা নিয়ে কলঘরে ঢুকল।

কনকের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

বিকেল চারটের সময়ে অভাবনীয় কাণ্ড—মঙ্গলার পুনঃপ্রবেশ। মুখ শুকিয়ে এতটুকু।

দরজা খুলে অম্বিকা ওকে দেখে যেন আঁৎকে উঠল—“ওমা আমার কি হবে গো।”

কনক হাত-মেশিনে বাচ্ছাদের জামা তৈরী করছিল, হঠাৎ অম্বিকার আর্তনাদে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল—“কি হ'ল মাসী, কি হ'ল?”

মঙ্গলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কনকও চম্‌কে উঠল, কিন্তু তার মুখে-চোখে সে ভাবটা প্রকাশ পেতে দিল না, শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে—“এস মঙ্গলা, ভেতরে এস।”

মঙ্গলার গতিতে উচ্ছলতা কোনদিনই কনক দেখেনি। কোনো মাগুষের

পায়ে পায়ে চন্দার মধ্যে যে এতখানি সঙ্কোচ, কুণ্ঠা, বেদনা বেজে ওঠে তা আজ এই মুহূর্তে মঙ্গলাকে না দেখ্‌লে কনক বিশ্বাস করতে পারত না। মঙ্গলার সঙ্কোচ দেখে কনক নিজেও একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করল—"মঙ্গলা, তোমার খাওয়া হয়েছে?"

মঙ্গলা চুপ করে রইল।

অম্বিকা বল্‌লে—"জলখাবারের রুটি দু'খানা বেশি আছে গিন্নিমা।"

কনক নিজেই রান্না ঘরে ঢুকে একখানি রেকাবীতে চারখানা রুটি এবং চচ্চড়ি নিয়ে এসে মঙ্গলার হাতে দিল—"আগে তুমি খেয়ে নাও তারপর শুনব তোমার কথা।"

মঙ্গলার কথা বলবার মত মনের অবস্থা নয়, তাছাড়া যে কথাটা ওকে বল্‌তে হবে হবে সেটাও মুখফুটে বলা সহজ নয় কোনো মেয়ের পক্ষে।

বার বার কনক প্রশ্ন করলে—"পিসিমা কি বল্‌লেন? তুমিই বা চলে এলে কেন? কি হয়েছে খুলে বলো দেখি, ভয় কি?"

মঙ্গলা কোনো জবাবই দিচ্ছিল না, কিন্তু ক্রমশঃ কনকের প্রশ্নে অসহিষ্ণুতার চাপা উত্তেজনা ফুটে উঠতে দেখে মঙ্গলা আস্তে আস্তে বল্‌লে—"আমার মত লোক ওঁদের দরকার নেই।"

"তার মানে? ওঁদের ঝি-এর দরকার নেই? তবে কেন লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেলেন ওঁরা?" কনক বল্‌লে।

"ঝি ওঁরা রাখবেন, কিন্তু—"

"এতে কিন্তুর কি আছে? তোমার নিশ্চয় কিছু দোষ দেখেছেন—"।

মঙ্গলা আবার মাথা হেঁট করে রইল—কনক অধীরভাবে বল্‌লে—"কি হ'ল, এরই মধ্যে কি দোষ করলে তুমি যার জন্তে পিসিমার মত ভালো মানুষও বিরক্ত হ'লেন। তেতেপুড়ে এতদূর থেকে গিয়েছ, উপোসী মানুষ, তোমাকে এইভাবে পাঠিয়ে দিতে পারলেন—আমি ত ভেবেই পাচ্ছি না বাছা এর কারণটা—বলো, বলো—"

মঙ্গলা মরীয়ার মত জবাব দিল—"আমাকে দু-মিনিট নিঃশ্বাস ফেলবার সময় দেননি উনি, দেখেই বললেন, 'একদণ্ড দেরী ক'র না বাছা, এই

নাও বাস-ভাড়া, সোজা যে পথে এসেছ সেই পথে যাও।' আমি দিদি, বাসে চড়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এনু।"

কনক চিন্তিতভাবে বললে—"কিন্তু পিসিমা ত তেমন মানুষ নন!" সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল কনক—"আর কিছু বলেন নি?"

"আর যা বলেছেন তা আমি বলতে পারব না দিদিমণি, তুমি মাপ করো—"

"না, না, মঙ্গলা, আমার কাছে লুকিয়ো না কিছু, তিনি যা যা বলেছেন সব শুনতে চাই।"

"দোহাই দিদিমণি, আমার কোনো অপরাধ নেই—"

"বল দেখি কি বলেছেন—"

"আমায় ঠিক বলেননি, বললেন সরকার বাবুকে—'কনক-বৌ না হয় ছেলেমানুষ, কিন্তু তুমি তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছ, এই কাঁচা বয়েসের ছুঁড়িকে কি ব'লে আনলে শুনি! এই বয়েসের যে মেয়েমানুষ নিজের সোয়ামী-পুত্তুর খায় সে ত মানুষ নয়, রাক্কুসী। আমি রাক্কুসী, নাকি ওঁর সোমত্ত ছেলেদের মাথা খারাপ ক'রে দেবো!" বলতে বলতে মঙ্গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল। ওর এই কান্না এতক্ষণ যেন কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে আট্‌কানো ছিল—এবারে ও লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। থেকে থেকে কান্নায় রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে অস্ফুট স্বরে বিষণ্ণ বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল—"রাক্কুসী।"

মঙ্গলার কান্নার বেগ প্রশমিত হতে অনেকক্ষণ লাগে।

ওদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

অম্বিকা বললে—"কি আর করবে বলো বাছা, এখন দিদির কাছেই এসো গিয়ে।"

মঙ্গলা তবু নড়তে চায় না।

কনকও দু-একবার সান্ত্বনা দিতে এসে ভাষা খুঁজে পেল না, তবু বললে—"ভেবো না মঙ্গলা, দেখি অন্য কোথায়ও তোমার কিছু একটা করা যায় কি না।"

মঙ্গলার অসহায় দু'চোখে নির্বোধ গাম্ভীর করুণ চাহনী টলমল।

এক সময়ে অম্বিকা আবার ওকে তাগাদা দিল—"বাবুর ফেরার সময় হ'ল মঙ্গলা, এবার বাড়ি এসো গিয়ে।"

মঙ্গলা শিউরে উঠল—"দিদি? দিদি যদি শোনে কি জন্তে ওরা আমায় রাখলে না তাহলে আর একছাদের তলায় আমাকে নিয়ে থাকবে না। ওরও ত ঘরসংসার আছে।"

কনক ওর কথাগুলো শুনতে পেয়ে হাতের কাজ বন্ধ ক'রে কি যেন চিন্তা করল, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে—"তুমি কিছু ভেবো না মঙ্গলা একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি দেখছি চেষ্টা ক'রে।"

মঙ্গলা যেন একটা কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়, ও রুদ্ধ কণ্ঠে বললে—"দিদিমণি, তুমি আমার জন্তে অনেক করেছ। আর কিছু চাই নে, আমাকে তোমার এখানে একটু আশ্রয় দাও না, মাইনে-টাইনে কিছু চাইনে, দিদির কাছে ফিরে গেলে লাথি-ঝাঁটা খেতে খেতে আমি আর বাঁচব না—"

কনক সহসা দলিতা ফণিনীর মতই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ওর মুখে-চোখে কঠিন একটা সংকল্পের দৃঢ়তা। ও বললে—"বলছি ত চেষ্টা ক'রে দেখব অন্ত কোথাও, তোমার কাজের যোগাড় করতে পারি কি না। তুমি এখন এস বাছা।"

মঙ্গলাকে যেন চাবুক মেরেছে কেউ—এতক্ষণের ক্লান্তি, অবসাদ, অসহায় ভাব সব কিছুই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ও উঠে বেরিয়ে গেল। ওর পদক্ষেপে এতটুকু সঙ্কোচ নেই, ব্রীড়া নেই।

দরজাটা বন্ধ করতে করতে অম্বিকা মাসী আপন মনেই বলে—"বয়েস এমনি জিনিস।"

দত্তদের বাড়ির যে ছেলেটা রাত বারোটা পর্যন্ত পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করে সেও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। নির্মলবাবু কিন্তু এখনও নিজের দপ্তরখানায় বসে রয়েছেন; আশেপাশের সবগুলো বাড়িই শুব্ধ—আর নিজের বাড়িতেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। নির্মল হাতের বইখানা মুড়ে রেখে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ঘাড় উঁচু করে না তাকালে ভগবানের আশীর্বাদ-আকাশকে দেখা যায় না এমনই অবস্থা এই বাড়ির। নির্মল পায়চারী করতে করতে এক একবার রেলিংএর সামনে ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করছেন কোনো ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে কি না—নির্জন রাস্তা, একটা কুকুর রয়েছে গ্যাসপোষ্টের গায়ে ঠেস দিয়ে।

পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে নির্মল চমকে ফিরে তাকালেন—"কে? ও, তুমি অমিতা!"

অমিতার চোখে ঘুম ভেঙে পড়ছে যেন, জড়িত কণ্ঠে অমিতা বললে—"হ্যাঁ গো, অনেক রাত হয়েছে শোবে চলো।"

—"শান্তিতে একটু ঘুমোবো তার কি উপায় আছে ছাই? এখুনি ত আমার চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে আসবেন তোমার ইয়ে—"

অমিতা ক্লান্ত ভঙ্গিতে রেলিং-এ হেলান দিয়ে বললে—"আমার ইয়ে মানে? আমার আবার কে হতে যাবে, তোমারই ত বাল্যসখা। কিন্তু রাত সাড়ে বারোটা যে বেজে গেছে—চলো এখন, সে আসবার হলে এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই আসত।"

—"অমিতা, এখনও সে এল না কেন? আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে—এরকম ত কখনও হয় না।"

যাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই আলাপ হচ্ছিল সে ব্যক্তিটির উপস্থিতি মোটেই সুখপ্রদ নয় বরং ভীতিপ্রদ এবং অপ্রীতিকরও বটে। নিয়মিত ভাবে রাত্রি এগারোটার সময় একটি লোক অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় নির্মলের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়, তারপর অকথ্য ভাষায় নির্মলকে গালাগালি দিতে শুরু করে। পাড়ার লোকেরা প্রথম দিকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে, এ নিয়ে থানায় ডায়েরীও

হয়েছে, কিন্তু সে সবই আজ থেকে ১৩।১৪ বছর আগের কথা।" ইদানীং কেউ আর এ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

নির্মল বাবু ঘরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বাইরে ফিরে এলেন—"তাই ত অমিতা, অবিনাশটার হ'ল কি? একটা বাজতে চলল এখনও বাড়ি ফিরল না! ও যেরকম বোম্বেটের মত ঘুরে বেড়ায় শেষে গুণ্ডার পাল্লায় পড়ে নি ত?"

অমিতা বিরক্তির সুরে ঝাঁঝালো ভাবেই জবাব দিল—"তোমার যেমন খেয়েদেয়ে ঘুম নেই, রাতদুপুরে কোন্ মাতাল বাড়ি ফিরল না তাই নিয়ে জেগে বসে থাকো,—আমি বাপু যাচ্ছি শুতে।"

—"যাও, যাও—তোমার ত সেই ভোর থেকে চরকীর পাক শুরু হয়েছে, তুমিই বা অনর্থক হাঁ করে বসে আছো কেন?"

—"আমার ভারি বয়েই গেছে। ওঁর মাতাল বন্ধু গালাগালি দিতে এলেন না কেন এ নিয়ে এক চুলও ভাবনার ধার ধারি না। তুমি যে কোর্টকাছারী ক'রে আবার দুপুর রাত পর্যন্ত নথীপত্র নিয়ে মাথার কাজ করো তোমারও ত মানুষের শরীর, সেই জন্যেই ঘুম আসে না—এই মানুষটার জন্যে আমার যত ফ্যাসাদ, নইলে কখন শুয়ে পড়তাম! চলো, ওগো, শোনো সে আর আসবে না আজ।"

—"আসবে না? তুমি বলছ কি। ছি ছি, তুমি তার মৃত্যু কামনা করছ অমিতা।"

—"ওমা! আশ্চর্য্যির কথা শোনো, মৃত্যু কামনা করব কেন? অবিশ্যি সে যেরকম তোমায় জ্বালাতন করে তাতে তার ওপর এক কড়ার দরদ থাকার কথা নয়—"

—"কিন্তু তুমি ওকথা বললে কেন অমিতা—"

—"আমি কিছু ভেবে বলিনি, সত্যি বলছি!"

—"তা নয় বুঝলাম! কিন্তু আমারও আজ মনে হয়েছে যে সে আর আসবে না! অবিনাশ আর আসবে না।/ আহা বেচারী অবিনাশ—"

—"আচ্ছা তুমি ওরকম যখন তখন ওকে বেচারী অবিনাশ. বলো কেন?

একটা হতভাগা লোক, তোমার অনেক বন্ধু দেখেছি—সবাই ত বেশ বড়লোক, আর বড়লোক না হলেও অবিনাশের মত বাউণ্ডুলে কেউ নয়। ও তোমার মান ইজ্জত—"

—"ভাখো অমিতা, তোমাকে আমি বার বার বলেছি অবিনাশকে হতভাগা বলতে পারবে না। খবরদার বলে দিচ্ছি—সে তোমার কি ক্ষতি করেছে যে তাকে এইভাবে যা-তা বলবে ?"

ঘরের আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে, সে আলোতে অমিতার গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখখানি বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এমন কি কপালের মধ্যদেশে লাল টকটকে কুমকুমের টিপটি জলজল করছে।

অমিতা হেসে উঠল—"তুমি আমার ওপর মিথ্যে রাগ করছ। আচ্ছা বলো রাগ হয় কি না। রোজ রোজ এই এক উৎপাত—"

—"তোমাদের ত কিছু সামলাতেও হয় না। একশ' দিন বলেছি যে তোমাদের অন্দরের দিকে রাস্তার গোলমাল যায় না, তোমরা সেখানে গিয়ে থাকো। মেয়ে মানুষের অত পথঘাটের কথায় থাকার কি দরকার।"

নির্মলবাবু বারান্দার কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মনে হল যেন গ্যাস পোস্টের পাশে একটা ছায়া নড়ছে, তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাহারাওয়ালা হেঁকে চলে গেল; তার জুতোর খট্‌খট্‌ শব্দ চারিদিকের গলিতে প্রতিধ্বনিত হয়ে আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল রাত্রির গভীরতায়।

অমিতা বললে—"ওগো, চলো, ঘরে চলো।"

নির্মল অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিলেন—"এই যাই।"

কিন্তু পাঁচ মিনিট আরও কেটে গেল চুপচাপ। অমিতা আবার বলল—"কি এত ভাবছ বলতো।"

—"না. কিছু না। চলো যাই।" নির্মল আর এক বার রাস্তার দিকে যেখানে কুকুরটা পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে সেইদিকে তাকিয়ে বললেন—"এই একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে কি ঘুম হবে ? ঠিক যখন ঘুম আসবে তখন হাঁক দেবে, নির্মল, এই নির্মলবাবু, ওরে হতভাগা নির্মল, বলে হাঁকাহাঁকি সুরু করে দেবে।

পাড়ার লোকে ত আমার ওপরেই বিরক্ত হবে।"

—"তাদেরই বা দোষ কি বলো, পাড়ায় এত লোক বাস করে, কই অবিনাশ ত ভুলেও আর কোনো বাড়ির দরজায় গিয়ে আর কাউকে অপমান করতে সাহস পায় না। রাত দুপুরে যত হাঙ্গামা হয় এই তোমার বাড়ির সামনে। লোকে ত বলে যে ইচ্ছে করলেই তুমি অবিনাশকে সায়েস্তা করতে পারো।"

—"সেই ত মুস্কিল কি না।"

—"মুস্কিল কি আমি ত কিছু দেখতে পাই নে, তুমিই তাকে মাথায় তুলে দিয়েছ, নইলে পাইনবাবুদের মেজকত্তা যখন অবিনাশকে লক্-আপএ ঠেলে দিয়েছিল তখন ত তুমিই পাঁচ জনের হাতেপায়ে ধরে মিটমাট করিয়ে এলে। কি গরজ ছিল, থাকত না-হয় কিছুদিন হাজতে—বেশ কড়া একটা শিক্ষা হতো। তা তোমার বন্ধুপ্রেম উথলে উঠল কিনা!...আচ্ছা কেন তুমি ওই হতভাগাকে এত আস্পদ্ধা দাও বলো তো!"

নির্মলবাবুর কণ্ঠস্বর সহসা রূঢ় হয়ে উঠল—"যাও, ঘরে যাও অমিতা। সব কথায় মেয়েদের থাকতে নেই।"

অমিতা নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘরে চ'লে গেল, যাবার সময় মৃদু কণ্ঠে বলে গেল—"আমি নয় যাচ্ছি কিন্তু তুমিও আর রাত ক'র না, এমন করে ব্লাডপ্রেশার আরও বাড়বে গো।"

—"আচ্ছা যাও"—অধিকতর গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন নির্মল।

নির্মল একবার ভাবলেন, থানাতে একটা টেলিফোন ক'রে খবর নেওয়া উচিত হবে কিনা। যদি—। পরমুহূর্তে মনে হ'ল, দীর্ঘকালের মধ্যে এরকম ঘটনা কখনও ঘটে নি। অবিনাশের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য শুধু নির্মল কেন সকলেই স্বীকার করে! এবং সেই কারণেই বড় একটা কেউ তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। অতএব নির্মল থানায় খবর নেওয়ার কথা বাদ দিলেন। কিন্তু একটু চুপ ক'রে বসে থাকলেই নানারকমের সম্ভব অসম্ভব আশঙ্কা উঁকি দেয়—নির্মলের মনে হ'ল একবার মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সীতে খবর নিলে হ'ত। কি জানি হয়ত বা কোনরকম এ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকতে পারে। কিছুই বলা যায় না।...আস্তে আস্তে নির্মল

উঠে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে কোন করলেন। "না, অবিনাশ চৌধুরী নামে কোনো কেস্ রেকর্ড হয়নি।"—জবাব এল। নির্মল বললেন—"কি জানি বলা যায় না, যদি এর পরও এই নামে কেউ আসে তাহলে আমাকে একটু জানাবেন দয়া ক'রে।"

দত্তদের বাড়ির ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। ছোক্রা দুলে দুলে ইতিহাস মুখস্থ করছে। এখান থেকে বেশ বুঝতে পারা যায়। নির্মলেরও এই রকম অভ্যাস ছিল, কোনো কিছু মুখস্থ করতে গেলেই নির্মল দুলতে শুরু করতেন, অবিনাশের অনেক তাড়নায় তাঁর এই কুঅভ্যাসটি দূর হয়েছিল। সত্যি, এককালে অবিনাশ ছিল হীরের টুক্‌রো ছেলে—বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে, গুণে অবিনাশের পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন জুড়ি খুঁজে পায় নি কেউ। অবিনাশ নির্মলকে খুবই ভালোবাসত। নির্মলকে সে নিজে হাতে গড়ে তুলেছিল—তারও কারণ সেই অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি। নির্মলের নিজস্ব স্টাইল বলে কিছু নেই—নির্মল নিজেও জানেন যে তাঁর যা কিছু বৈশিষ্ট্য সে সবই অবিনাশের কাছে পাওয়া। অথচ আজ অবিনাশকে যারা চেনে তারা কেবল অবিনাশের চারিত্রিক দুরাচারের জন্যই চেনে, আর কেউ-কেউ চেনে নির্মলের অভাজন বন্ধু ব'লে। কথাগুলো মনে হ'তেই নির্মল হেসে উঠলেন।

—"কি গো একা-একা হাস্‌ছ কেন, কি হ'ল?"

—"কে?" চমকে ফিরে তাকালেন নির্মল—"ও তুমি, অমি। তুমি কি ঘুমোও নি নাকি?"

—"না, আমি বেশ ঘুমিয়েছি। কিন্তু তোমার কি হয়েছে গো? অমন একা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসছিলে কেন?"

নির্মল অতিমাত্রায় সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন—"এই আমার অবস্থা দেখে! ভোর হয়ে গেল কিনা একটা মাতালের পথের দিকে চেয়ে চেয়ে। ভাবো দেখি একবার, কলকাতার বিশিষ্ট আইনজ্ঞ নির্মল চৌধুরীর চল্লিশ বৎসর বয়সে কি কাণ্ড—"

অমিতা উৎকণ্ঠিত ভাবে বললেন—"ও গো আর পাগলামী ক'রো না—যাও এখনও ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোতে পারবে, চলো—চলো।"

অমিতার মুখের পানে তাকিয়ে নির্মল হাসলেন, সে হাসিতে আর যাই থাক আনন্দের স্ফুরণ ছিল না।

অমিতা নির্মলের হাত ধরে একটু জোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেই নির্মল যন্ত্রচালিতের মত ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন—"নাঃ, চলো। মাথাটা কেমন ঝিম্‌-ঝিম্ করছে। একটু ঘুম চাই।"

সেদিন সকালে নির্মলের উঠ্‌তে বেশ বেলা হয়ে গেল। উঠেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন সাতটা বেজে তেত্রিশ মিনিট। পায়ে চটিটা গলিয়ে সোজা বৈঠকখানার দিকে চললেন। ঠিক সাড়ে সাতটায় তিনি বৈঠকখানায় হাজিরা দেন—এ হচ্ছে পনের বছরের অভ্যাস। পিছন থেকে কমলা ডাকলে—"বাবা, তুমি বাথরুমে গেলে না যে!"

—"বড্ড দেরি হয়ে গেছে রে—"

—"মুখ না ধুয়েই চা খাবে?"

—"দাঁড়া, একবার ঘুরে দেখে আসি।"

—"না বাবা, অবিনাশ কাকা আসেন নি এখনও। তুমি বরং মুখটা ধুয়ে নাও, উনি এলে আমি বসতে বলব।"

—"তুই, তুই—আচ্ছা তুই বস্‌তে বলিস।"

বাথরুম থেকে বেরিয়ে নির্মল বৈঠকখানায় এসে একলাই বসলেন অবিনাশ আজ এখনও আসেনি।

অবিনাশ এ বাড়িতে রোজ সকালে আসে। তবে ওই বৈঠকখানা পর্যন্ত তার গণ্ডী। এ বাড়ির আর কোনো মানুষকে সে যেন চেনে না বা চিনতেও চায় না। সে সোজাসুজি ঘরে ঢুকেই নির্দিষ্ট একটি চেয়ারে বসে। মিনিট খানেক চুপ-চাপ বসে থাকার পর নিজে থেকেই বলে—"অবিশ্যি তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না জানি—" খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নির্মল অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তাঁর চোখের সামনে থেকে সংবাদপত্রের হরফগুলো মুছে গিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল অবিনাশের বিষণ্ণ রুক্ষ মুখখানা।

নির্মল খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে বলেন—"থাক ওসবে আর কাজ কি!"

—"না ভাই, সত্যি বল্‌ছি, আজ থেকে আর অমন কাজ হবে না। তুমি ত অনেক ক্ষমা করেছ আজকের দিনটাও করো—"

নির্মল অল্প কথার মানুষ, তিনি কোনো উত্তর দেন না, একটু হয়ত হাসেন। সে হাসিতে শ্লেষের চেয়ে অবিশ্বাসই থাকে বেশি।

অবিনাশ বন্ধুর দিকে মিনতি করুণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—"পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলে তুমি নির্মল, তুমিও আমায় ত্যাগ করলে? পারলে না ক্ষমা করতে?"

নির্মল গম্ভীর ভাবে বলেন—"এতে আমার ক্ষমা করার কি থাকতে পারে? বেশ ত দেখাই যাক, আজও রাত্তির হবে, এগারোটা রাতে আবার ত পাড়ার লোকেরা জানতে পারবে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এসে ডাকছে—ওরে শালা নির্মল, উল্লুক বদমায়েস ইতর নির্মল। ছাখো অবিনাশ, আমার ত তোমাকে চিনতে বাকী নেই।"

অবিনাশ আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌তে বাধ্য হয় যেন—"হ্যা, আমাকে তুমি ঠিক চিনেছিলে, আমিই ভাই পারিনি তোমাকে চিনতে। সেই ভুলের জন্যেই ত আমার এ দুর্দশা! যাক তোমরা মহৎ তোমরা উদার—তবু বলি এই আজকের দিনটা আমায় মাপ করো।" বল্‌তে বল্‌তে অবিনাশের এলোমেলো খোঁচা খোচা গোঁপগুলো কেমন ফুলে ফুলে ওঠে। দুর্জয় বর্ষার বেগে যেমন রুক্ষ পাহাড়ের বুক ভাসিয়ে জল নামে তেমনি অবাধ অশ্রুর বন্যায় অবিনাশের অত্যাচার চিহ্নিত পরুষ মুখখানা চকচকে হয়ে যায়। একটা সরলতায় অবিনাশ স্নান করে ওঠে। নির্মলের সপ্রতিভ গম্ভীর চেহারায় তার প্রতিফলন হয় আশ্চর্যরকম। নির্মল চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন—গতরাত্রির অপমানের পুঞ্জীভূত অভিমান ধুয়ে চলে যায় কোন্‌ দূরে।

নির্মল বিচলিত কণ্ঠে বলেন—"যাও, আর ছেলেমানুষী করে না। বয়স হচ্ছে আমাদের, ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, এখন একটু

সামলে চলা উচিত। অনেক ত শাস্তি দিয়েছ আমাকে, এখনও পারলে না ক্ষমা করতে?"

অবিনাশ চোখ মুছে বলে—"কি জানি ভাই ঠিক বুঝতে পারি না। আমি ইচ্ছে ক'রে কেলেঙ্কারী করি না। খুব শক্ত হয়েই ত সব সময় থাকি। কিন্তু রাত দশটা বাজলেই আমি যেন বদলে যাই। কিন্তু আজ থেকে আর তা হতে দেবো না, দেখে নিয়ো।"

পিছনে পায়ের শব্দ হতেই নির্মলের হুঁস হল যে তিনি একাই বসে আছেন। তখন বুঝতে পারলেন, কোরিয়ার যুদ্ধের অবস্থা বিশেষ কিছু পরিবর্তিত হয় নি, এই খবরটাই প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা অধিকার ক'রে রয়েছে।

কমলা চা দিয়ে গেল—এক কাপ।

নির্মল একবার চায়ের কাপের দিকে তাকিয়ে একটা চুমুক দিয়ে মেয়েকে প্রশ্ন করেন—"হ্যাঁ রে, কেউ এসে ফিরে যায় নি ত?"

—"না বাবা, কেউ আসেনি। আচ্ছা বাবা, অবিনাশ কাকা ত এখনও এলো না, আটটা বেজে গেল।" 'কেউ' বলতে যে নির্মল বাবু অবিনাশের কথাই জিজ্ঞাসা করেছেন কমলা তা জানে।

—"সেই কথাই ভাবছিলাম মা। কি যে হ'ল তার?"

—"অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

—"আমারও সেই রকমই একটা ইয়ে হচ্ছে। দেখি খোঁজ নিতে হয় তাহ'লে!"

—"হ্যাঁ বাবা কাউকে পাঠাবো?"

—"থাক, তুমি তোমার কাজ করো গে,—যা হয় আমিই করব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠকখানাটা লোকে লোকে ভরে' গেল। কাজের চাপে মানুষটা যান্ত্রিকতায় মিশে গেল।

কোর্টে বেরুবার সময় নির্মলবাবু গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। অবিনাশের বাড়ির সামনের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। কড়া নাড়তেই চাকরটা সাড়া দিল—"এই যাই বাবু।"

দরজা খুলতে খুলতেই, চাকরটা আপনমনে বক্‌ছে, "উঃ সারারাত এই হানাবাড়িতে একা কি থাকতে পারি? কী ভয়ই যে—"দরজা খুলে সামনে নির্মলের চোস্ত সাহেবী চেহারা দেখে চাকরটা হতভম্ভ হয়ে গেল।

নির্মল বল্লেন—"তোমার নাম কি?"

—"আজ্ঞে আব্‌নি? আমি মনে ক'রলাম অবিনাশ বাবু এয়েছেন বুঝি।"

—"কাল রাত্রে বুঝি বাবু ফেরেন নি?"

—"আজ্ঞে আমিও ত ভেবে ভেবে সারা সকাল বসেছিলাম। এখন বলি কি, দিনরাত উপোস ক'রে ত আত্মাকে জ্যান্ত রাখা যায় না, তাই বলি কি আত্মা চড়িয়ে দেলাম।"

—"আচ্ছা।"

—"আজ্ঞে আব্‌নি বাবুর কিছু খোঁজ জানেন নাকি?"

—"তোমার বাবুর খোঁজ রাখা ছাড়াও আমার অন্য কাজ রয়েছে।"

—আজ্ঞে তা বলিনি, কাল কি উনি আব্‌নার বাড়ি যানে ইয়ে—" কথাটা পুরোপুরি শেষ করতে পারল না চাকরটা, বোধ হয় তার প্রয়োজনও ছিল না।

নির্মল বল্লেন—"পেট ভরে খেয়ে দেয়ে বাবুর একটু খোঁজ-খবর ক'রো!"

—"আজ্ঞে তা ত করতেই হয়, মুনিবও যা দিতেও তাই। সত্যি আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে।"

সেদিন রাত্রেও কেউ এসে হাঁকা-হাঁকি করল না—তবু রাত এগারোটা বেজে গেল, বারোটাও বেজে গেল। গ্যাসপোস্টের পাশে কুকুরটা শুয়েছে, দত্তদের ছেলেটা পড়া বন্ধ ক'রেছে। অমিতা এসে দু'বার খবর নিয়ে গেছে।

নির্মল আকাশ পাতাল ভাবছেন, আজও অবিনাশের কোনো খোঁজ খবর নেই!...যখন প্রথম প্রথম অবিনাশের উপদ্রব শুরু হ'ল, তখন রোজই সন্ধ্যা থেকে নির্মল অস্বস্তি ভোগ করতেন। কেবলই মনে হ'ত, কি ক'রে

এই উৎপাত বন্ধ করা যায়। এক-একদিন এক-একটা উপায় আবিষ্কার করতেন। একদিন হ'ল কি, তিনি হুকুম দিলেন রাত ন'টার মধ্যে খাওয়া চুকিয়ে ফেলতে হবে। সেদিন সাড়ে ন'টার সময় নির্মল নিজে হাতে জানালা দরজা সব বন্ধ ক'রে দিয়ে বাড়ি অন্ধকার ক'রে ছাদের উপর গিয়ে ব'সে রইলেন। তার ফলে সেদিন গালাগালির মাত্রা বেড়ে গেল, অবিনাশ গলা ফাটিয়ে চীৎকার শুরু ক'রে দিল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে নির্মল দরজা খুলে বাইরে এলেন। তারপর চীৎকার থেমে গেল, অবিনাশ জড়িত কণ্ঠে বললে—"বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! গ্যাড়াকল ক'রে আমায়—আমায়—আর ঠকাতে পারবে না কোনো মিঞা। হুঁ।" পরদিন নির্মল বাড়ির সামনে রাস্তার দরজার আলোটা পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখে দিলেন, সারা বাড়ি আলোর আলো ক'রে রেখে নীচের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিনও চীৎকার গালাগালি কিছু কম হ'ল না। ওপাশে দত্তদের বাড়ি পার হয়ে ঠিক এ বাড়ির সদর দরজার সামনে এসেই অবিনাশ হাঁক দিল—"এই যে, খুব পয়সার গরম হয়েছে দেখছি, মক্কেলদের গলায় আঁকশী লাগিয়ে। বাঃ, বাঃ রে কলি, licensed liar একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে।" এবং তারপর অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে দিল অবিনাশ। সেদিন বোধহয় চরম ভাষা ব্যবহার ক'রেছিল সে, যার ফলে নির্মল সহ্য করতে না পেরে রাস্তায় নেমে গিয়ে অবিনাশের গলা টিপে ধ'রে বলেছিলেন—"দেবো দেবো আওয়াজ বন্ধ ক'রে? বাঁদরামী ঠাণ্ডা ক'রে দেবো?"

অবিনাশ জ্বলে উঠেছিল—"গলার আওয়াজ বন্ধ করবার আগে তাহলে একবার কেলেঙ্কারীটা চাউর ক'রে দিয়ে যাই। আমাকে মরণের ভয় দেখাতে এয়েছ? বেশ মারো। কিন্তু তার আগে মাধুরীর—"

নির্মল আরও জোরে অবিনাশের গলা চেপে ধ'রে কথাটা বন্ধ ক'রে দিতে চান। অবিনাশ হঠাৎ এক ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গর্জে উঠল—"থাম নিমে, তোকে আমি কুকুরের মত ঘেন্না করি। খবরদার আমাকে তুই ছুঁতে আসিস নে। গায়ে আমার জোর আছে, বুকে আমার দিল আছে, মনে আমার ক্ষমা আছে—নইলে তোকে নখের ডগা দিয়ে চিরে-ফেড়ে

ফেলতে দু'দণ্ড দেরি হ'ত না। শুধু নিজের জ্বালায় জ্বলি—আমার ভুবন জ্বলছে। যা—যা ঘরে যা—তোর বৌকে বিধবা করব না। পালা আমার সাম্‌নে থেকে। বেইমান—"

নির্মল ত্রস্তার্ত দৃষ্টিতে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

অবিনাশ তাচ্ছিল্যভরে বল্লে—"জোচ্চরদের মত ছুঁচো নই। আমার কখনও কথার খেলাপ হয় না। যা, আমাকে আর ঘাঁটাসনে। মুখেও তালা দেওয়াই ছিল, এতদিন ত খুলিনি।—তালা ভাঙতে চেষ্টা করিস নে নির্মল, এ ঘরে সাপ আছে, সে সাপের খুব বিষ। সইতে পারবি নে। সরে যা—"

হঠাৎ শাঁখ বেজে উঠল, উলুর শব্দও ভেসে আসছে। কোথায় বিয়ে হচ্ছে। নির্মলের মনটা আবার বাস্তবে ফিরে এল! ...মনে পড়ে গেল—অবিনাশ আজও আসেনি। নিজের অস্থিরতায় নির্মল যেন আপনার কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়েন। মিথ্যে ব'সে ব'সে রাত জেগে কাটানোর কি অর্থ থাকতে পারে?

নির্মল বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না। খুট্‌খুট্ শব্দ যদি একটু হয়েছে অমনি চম্‌কে উঠে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেন—এই বুঝি অবিনাশের গালিগালাজ শুরু হ'ল। কিন্তু পরমুহূর্তে ভ্রান্তিনিরসন ঘটে। অবিনাশ আসেনি।

পরদিন কোর্টে বেরুবার সময় নির্মল অমিতাকে বল্লেন—"হ্যাঁ গো আমাদের সেই পুরোনো ফটোর অ্যালবামখানা কোথায়?"

—"আলমারিতেই ত ছিল, কেন হঠাৎ অ্যালবাম দিয়ে কি হবে?'

—"আছে, দরকার আছে—বার করো ত সেটা।"

অ্যালবামের মধ্যে অবিনাশ ও নির্মলের ছেলে-বেলার অনেকগুলি ছবি প্রায় বিবর্ণ হয়ে আশ্রিত রয়েছে। যৌবনের দু'খানি মাত্র ছবি—একটি ধুতি-পাঞ্জাবী পরা। আর একটা ডিগ্রী নিয়ে কনভোকেশন গাউন পরা। নির্মল ধুতি পাঞ্জাবী পরা চেহারার ছবিখানা বেশ কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনেই বললেন—"এ চেহারা দিয়ে বিজ্ঞাপন করলে সে মানুষকে চিনে বার করবার সাধ্য হবে না, নাঃ—"

অমিতা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল—"কি ব্যাপার বল তো। সকাল থেকে ত আকছার মক্কেলদের তাড়িয়ে দিলে, এখন বেলা দশটায় এ্যালবাম দেখতে বসেছ– আজ কি কোর্ট-কাছারী বাতিল?" অমিতার কণ্ঠে বিস্ময়, অবিশ্বাস এবং আতঙ্ক তিনই ফুটে ওঠে। এরকমভাবে যে নির্মল অকারণে কোর্ট কামাই করেছেন এ ত অমিতার মনে পড়ে না। অকারণে এ্যালবাম নিয়ে নির্মল বাজে সময় নষ্ট করবেন এ কথাটা কানে শুনলে অমিতা বিশ্বাস করতে পারত না। নিজের চোখকে ত অবিশ্বাস করতে পারে না—নির্মলের এই অস্বাভাবিক আচরণ দেখে অমিতার দুর্ভাবনা হওয়াই স্বাভাবিক।

নির্মল বলেন—"জলজ্যান্ত মানুষটা হাওয়া হয়ে গেল, তার একটা খোঁজ খবর ত করা দরকার। তাই মনে করেছিলাম যে ছবি দিয়ে একটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখি। কিন্তু এ ছবি মিলিয়ে মানুষ খুঁজে বার করা একেবারে অসম্ভব। এখন কি করা যায়।"

সাত দিনের মধ্যে অবিনাশের খোঁজ পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ পরপর কয়েকটা রাত্রি ঘুম না হওয়ার ফলেই নির্মলও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মেজাজ সব সময়েই তাঁর রুক্ষ। থেকে থেকে চমকে উঠে বসছেন, আবার শ্রান্ত বিষণ্ণ অবসাদের শৈথিল্যে নির্মলের দেহটা এলিয়ে পড়ছে বিছানার ওপর, ডাক্তার বলছেন—নার্ভাস ব্রেক ডাউন। ঘন ঘন ঘুমের ওষুধ দিয়ে তাঁকে অচেতন রাখা হচ্ছে। এইভাবেই দিন রাত্রি কাটছিল। হঠাৎ সেদিন ঘুম ভেঙেনির্মল বাবু ডাকলেন—"অমি অমি, একটা কথা শোনো—তোমরা আমাকে এভাবে জ্যান্ত অবস্থায় মেরে রেখো না। উঃ, কী কাণ্ড, আমি বেঁচে আছি অথচ আমার এই বাঁচার কোন চেতনা নেই। শোনো, একটা কথা বলি—খুব দুর্বল হয়ে গেছি। এখন আর বেশি কড়া ওষুধ দিয়ে যদি আমায় ঘুম পাড়াও তোমরা সে ঘুম আর নাও ভাঙতে পারে।"

অমিতা মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে বললে—"ছিঃ, ওসব বলতে নেই!"

সত্যিই নির্মলবাবুর হার্টের অবস্থা আশাপ্রদ নয়। ডাক্তার রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

রাত্রে একটা হাল্কা নীল আলো জ্বলছে রয়েছে নির্মলের ঘরে। অমিতা

বসে রয়েছে পাথরের মত নিশ্চলপ্রায় স্পন্দনহীন অবস্থায়; কমলা এসে বললে—"মা তুমি যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও। শেষে তুমিও যদি পড়ো তাহলে আর রক্ষে নেই।"

অমিতা ম্লান হাসি হেসে বললে—"না রে পাগলী তোর মায়ের কিছু হবে না। তুই যা দেখি, এক রত্তি মেয়ের গিন্নিপনা দেখো।"

—"না মা, তুমি ঘন্টা খানেক জিরিয়ে নাও। আমি একঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছি।"

অমিতার চোখ দুটো যেন ঘুমের নামেই বুজে আসে, তবু শাসন করে নিজেকে অমিতা।

কমলা তেরো বছর বয়সেই যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে যেন। ও কিছুতেই মায়ের কথা মানতে রাজি নয়; অগত্যা অমিতা ঘরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অমিতার নাক ডাকতে লাগল।

নির্মল হঠাৎ চমকে উঠেছেন—"ওই, ওই এসেছে! ওকে বেশি হাঙ্গামা করতে বারণ করে দাও। সত্যি আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। অবিনাশ—শোনো অবিনাশ।"

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে আবার বকতে লাগলেন নির্মলবাবু—"ওকে বারণ করে কি হবে। ওর একটুও দোষ ছিল না। না না, আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে। এতদিন বলি নি, বলতে পারিনি। কিন্তু আজ আমি না বললে ওর আসল চেহারাটা কেউ চিনতে পারবে না। শোনো অমিতা, ওই অবিনাশ আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসত। ওর হাতে গড়া দুটি মানুষ—আমি আর মাধুরী। মাধুরীর নাম শোনোনি?—শুনবে কি করে, অবিনাশ ত মুখে চাবী দিয়েছিল। মাধুরী হচ্ছে ওর বোন।"

কমলা ডাকলে—"বাবা বাবা!"

—"আঃ, আমায় বাধা দিও না, আমি আজ বলবই। এখন না বললে আর হয়ত বলতে পারব না। মাধুরী আমায় ভালবাসত—ওরা দুজনে—ভাইবোন মিলে আমাকে যে কী ভালোই বাসত। অবিনাশ জানতো আমি মাধুরীকে বিয়ে করব—".

কমলা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে, একটা অজ্ঞাত ভয়ে ওর গা ছমছম্ করে উঠলো। একবার মনে হল মাকে ডেকে তুলতে হবে—কিন্তু মায়ের ক্লান্তি মাখানো মুখের ওপর যে শান্ত নিদ্রার আবেশ নেমেছে সেটা এইভাবে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করল না। কমলা কিছু ভেবে না পেয়ে চুপ করে বসে রইল।

নির্মলবাবু বলছেন—"অবিনাশের গার্জেন বলতে আমি। ওর বিয়ের জন্যে সরাই আমার কাছে হাঁটাহাঁটি করে। অবিনাশ বললে,—'তুই মেয়ে দেখবি, তুই সব করবি। আমি শুধু পিঁড়ির ওপর গিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে বসব।' এসব কথাবার্তা প্রায় রোজই একবার ক'রে হত। অবিনাশ বলত —'আগে মাধুরীকে বাড়ী থেকে তাড়াবো, তারপর বৌ আনব—নইলে পোড়ারমুখী ভাইয়ের কাছে ভাজের নামে সাতখানা করে লাগাবে, বুঝলি নিমু।' আর মাধুরী বলত—'আমার বিয়ের আদ্দনাদ্দু বুঝি দাদা ভাজতে বসবে শাড়ী পরে। উহুঁ, তা হবে না, বৌদি আমার বিয়ে দেবে।' সে একটা জগৎ বুঝলে অমিতা!"

কমলা চীৎকার করে উঠল—"বাবা! বাবা!"

নির্মল একটু হাসলেন—"একটু জল দাও!"

জলটুকু খেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নির্মল বললেন—"হ্যাঁ রে, তোর মা কোথায় গেল?"

—"মাকে একটু ঘুম পাড়িয়েছি বাবা!"

—"আহা বেচারীর বড় খাটুনী হচ্ছে রে! ঘুমোক, তা ঘুমোনো ভালো।" ব'লে চোখ বুজলেন নির্মলবাবু।

ঘণ্টাখানেক পরে আবার নির্মলবাবু বকতে লাগলেন—"অমিতা, অমি—তোমাকে দেখে অবধি আমার কি যে হ'ল জানিনা আমি আর কাউকে কিছু জানালাম না—অবিনাশের বাড়ি যাওয়া আমার বন্ধ হ'ল। কেউ জানল না যে তোমাকে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম অবিনাশের জন্যে। হ্যাঁ, জানত অবিনাশ। তুমি সেবারে গানের কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলে, খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখেই ওর পছন্দ হয়েছিল। ওকে আমি বলেছিলাম যে, আমি কোটাল-পুত্র যাবো, গিয়ে রাজকন্যা এনে তুলে দেবো, রূপকুমারের হাতে।...তোমার

াবার কাছে পরে বললাম, নিজের জন্তে নিজেই মেয়ে দেখতে যাবো একথা
ললে খারাপ শোনায়, সেই জন্তেই গোড়াতে বন্ধুর অজুহাত দিয়েছিলাম। মনে
ে মাধুরীর জন্তে একটু কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সে তুলনায় তোমার নেশাটা
নেক, অনেক বড়। বুঝলে—বুঝলে—বুঝলে অমি—অমিতা!"

কমলা এবারে তার মাকে ঠেলে তুলল।

অমিতা ব্যস্তভাবে উঠে বসল, "কি হয়েছে, কি হয়েছে রে কানু!"

কমলা কোনো জবাব দিল না। নির্মলবাবুর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।
মিতা ঝুঁকে পড়ে পরখ করল—নিশ্বাস পড়ছে।

সে রাত্রে নির্মল বেশ শান্ত হয়ে ঘুমোলেন।

ভোরের দিকে জেগে উঠে আবার বকতে শুরু করলেন—"অবিনাশের
কানো দোষ নেই। জানো, ওর বুকে কত বড় আঘাত আমি দিয়েছি?
াধুরী ত গঙ্গায় ডুবে মরেছিল—ঠিক আমার বিয়ের পরদিন।"

অমিতা চমকে উঠল—"হ্যাঁ গো, মাধুরী কে?"

—"মাধুরী, মাধুরী! কেন মাধুরীর কথাই এতক্ষণ ধরে বলছি। আর
কছু লুকিয়ে রাখিনি—সত্যি বলছি আর কোন কিছু গোপন করি নি।"

অমিতার সন্দেহ হ'ল বুঝি বা নির্মলবাবু ভুল বকছেন—কিন্তু নির্মলের চোখ
খের চেহারায় সে রকমটা মনে হয় না। অমিতা আবার জিজ্ঞাসা করল—
কার কথা বলছ? যাক্ গে, এখন ঘুমোও।"

—"বাঃ, তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে? অবিনাশের বোনের কথা বললাম
গো। না, না, আমি বলেছি, সব বলেছি—অবিনাশের জন্তে তোমায়
খতে যাওয়ার কথা, মাধুরীর প্রেমের কথা সবই ত বলেছি!"

—"না, না, আমায় কিছু বলো নি।"

নির্মল চীৎকার ক'রে উঠলেন—"আলবাৎ বলেছি। নইলে আমার বুকটা
ত হাল্কা মনে হ'তে পারে না। পনের বছরের বোঝাটা আর নেই ত!
লেছি,—বলেছি।"

কমলার ঘুম ভেঙে গিয়েছে ওর বাবার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে। ও আস্তে
আস্তে উঠে নির্মল বাবুর খাটের পাশে এসে দাঁড়াল। নির্মলের দুর্বল হাত-পা

তখনও ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে আর স্খলিত কণ্ঠে নির্মল বলছেন—"আমি বলেছি, মাধুরীর কথা বলেছি, আমার ইতরতার কথা বলেছি—হ্যাঁ, বলেছি। আর অবিনাশ আমাকে দোষ দিতে পারবে না, ভদ্রলোকের মুখোশ আর পরে নেই আমি, দেখতে পাচ্ছ না? তবু, তবু তুমি বলছ অমিতা যে আমি এখনও লুকিয়ে রেখেছি।"

অমিতা স্বামীকে শান্ত করবার জন্যে বললে—"হয়ত বলেছ আমি শুনতে পাই নি।"

—"না, না, আমি তেমন করে বলিনি। বেশ মনে আছে।"

কমলা আস্তে আস্তে বললে—"মা তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে—আমি ডেকে দিলাম যে।"

নির্মলবাবু উৎসাহিতভাবে ব'লে উঠলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই ত আমাকে জল দিয়েছিস। তুই শুনেছিস ত সব?" পরমুহূর্তেই তাঁর মুখখানা কালো হয়ে গেল, ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"তুই, তুই, তুই শুনেছিস? সব শুনেছিস? ও তুই বুঝি জেগে বসে ছিলি, এঁ্যা! অমিতা, অমিতা—কি হবে।"

নির্মলবাবুর কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে গেল, তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আস্তে আস্তে সেইটুকুও স্তব্ধ হ'ল। পাশের ঘরে ঘড়িটা টিক্-টিক্ করছে। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হ'ল তখনই—। এর মধ্যেই যে, নির্মলবাবুর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হবে তা কে জানত?

পশ্চিমের শহর, ছোট হ'লেও নোংরা নয়। অবিনাশের মন্দ লাগছে না। বেশ ক'দিন কাটছিল, আজ বিকেলে খবরের কাগজ দেখতে দেখতে নিজের নিরুদ্দেশ সংবাদ দেখে প্রথমটা খুব একচোট হেসে নিয়েছিল, কিন্তু এই হাসিটা খুব বেশিক্ষণ তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দিল না। নিরুদ্দেশ সংবাদটা সব খবরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্মল চৌধুরীর কাছে খবর পাঠাতে বলছে! তার মানে নির্মল অবিনাশের জন্য চিন্তিত?…

অবিনাশ কি ফিরে যাবে কল্‌কাতায়? কল্‌কাতা থেকে পালিয়ে আসার দিনটি বেশ মনে পড়ছে।

সকালে উঠেই নির্মলের বাড়ি উপস্থিত হ'ল অবিনাশ। দরজা বন্ধ ছিল। বোধ হয় সেদিন একটু ভোর-ভোর থাকতেই অবিনাশ গিয়ে পড়েছিল। দরজা বন্ধ দেখে অবিনাশ ভাবলে ফিরে যাওয়াই ভালো—কাকে আবার ডাকবে, কে এসে দরজা খুলবে—খুলবে কি খুলবে-না তারই বা ঠিক কি? অবিনাশ উল্টো দিকে দু-চার পা এগিয়েছে এমন সময়ে পিছন থেকে কে ডাকল— "কাকাবাবু! কাকাবাবু!" কণ্ঠস্বরটা ভারি মিষ্টি। এত মিষ্টি ডাক অবিনাশ যে কতদিন শোনে নি! অবিনাশ বিস্ময় বিহ্বল ভাবে ফিরে দাঁড়ালো। একটি কিশোরী মেয়ে নির্মলের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—"আসুন। আপনি চলে যাচ্ছেন যে।"

অবিনাশ অপ্রতিভ হয়ে গেছে।

মেয়েটি এবার পথে নেমে এসে যেন হুকুম করল—"চলুন, ঘরে বসবেন চলুন—বাবাকে খবর দিচ্ছি। উনি এক্ষুনি আসবেন।"

অবিনাশ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটিকে প্রশ্ন করে—"তোমার নাম কি মা?"

—"আমি কমলা। বাঃ, আপনি বুঝি জানেন না? আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন না কেন?"

হঠাৎ এ প্রশ্নটা অবিনাশের কাছে অপ্রত্যাশিত। এর জুৎসই জবাব খুঁজে পেল না সে—"আচ্ছা এবার থেকে বলব।"

কমলার দিকে অবিনাশ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছিল। সে যেন কিছু একটা খুঁজছিল। অবিনাশ চেয়ার থেকে উঠে কমলার খুব কাছাকাছি এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল। কমলা আপনার মনেই বললে—"আপনি কি দেখছেন কাকাবাবু?"

—"দেখছি, দেখছি—এই তোমাকে।" বলেই অবিনাশ থেমে গেল।

কমলা হেসে উঠ্‌ল, সরল স্নিগ্ধ হাসি—"আমায় কিন্তু সবাই বলে, মায়ের মত হ'ল না।"

—"বাজে কথা, তারা কেউ কিছু জানে না।"

—"আচ্ছা কাকাবাবু আপনি রাত্রে অত চেঁচামেচি করেন কেন ? আমাদের ক্লাসের মেয়েরা সবাই বলে আপনি নাকি পাগল !"

অবিনাশ সে কথার জবাব দিল না, বললে—"তোমার বাবাকে একবার ডেকে দাও ত মা।"

কমলা চলে গেল।

নির্মল ঘরে ঢুকেছে—অনেকক্ষণ কেটে গেছে তবু অবিনাশের হুঁস নেই। অবিনাশ ভাবছে, তার ভাবনার কোনো ছক নেই, নেই কোনো দিশা, এলোমেলো টুক্‌রো ছবিরা ভিড় করছে পিছন দিক থেকে।

নির্মল যখন প্রশ্ন করলে—"কি, শরীর ভালো আছে ত?" তখন অবিনাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বহুদিনের পুরোনো ভূমিকায় অভ্যস্ত অভিনেতার মত কেঁদে পড়ে ক্ষমা চাইল—"ভাই, ক্ষমা করো ভাই, আর কোনো দিন হবে না এরকম কাজ।"

তারপর সারাদিনের কাজের ফাঁকে কেবলই মনে হয়েছে কমলার কথা—কমলার কি মিষ্টি ডাক। অমন মিষ্টি ডাক অবিনাশ শুনতে পায়নি জীবনে কখনও। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে—"আচ্ছা কাকাবাবু, আপনি রাত্রে অত চেঁচামেচি করেন কেন?" এরকম মিষ্টি কথায় এতবড় কঠিন তিরস্কারও অবিনাশকে কেউ কোনোদিন করতে পারেনি। হঠাৎ কোথা থেকে কি হলো অবিনাশ আফিসে আর কাজ করতে পারল না। কতবার বাথরুমে গিয়ে চোখের জল মুছে এসেছে।

বড় হয়েছে। অমিতারই ত মেয়ে কমলা। নির্মল এতদিন হাজার বার বলেছে—"ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, এখন তুমি একটু সামলে চলো—তাদের কাছে বড় লজ্জায় পড়তে হয়।" কিন্তু আজই এই প্রথম অবিনাশ বুঝতে পারল—রাত্রে যে অবিনাশ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় উপদ্রব করে তার কৃতকার্যের জন্য পিতৃস্নেহস্নিগ্ধ একটি মানুষ কত বড় সংকোচ অনুভব করছে।

সেদিন অবিনাশ যখন বার-এ বসে হুইস্কির অর্ডার দিলে তখনও নিজের মনের ভেতরের প্রতিক্রিয়ার গম্ভীরতার খবর পায় নি। কিন্তু পাত্রটি মুখে তুলতে গিয়ে তার হাত কেঁপে পড়ে চুরমার হয়ে গেল কাচের পাত্রটা।

কমলার সেই মিষ্টি ডাক "কাকাবাবু"। কমলার সেই আর্দ্র অনুনয়—"আপনি কেন রাত্রে এত চেঁচামেচি করেন?"

অবিনাশ বার থেকে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে গাড়ীতে চড়ে বসেছে।···ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, তাদের সামনে এ মুখ আর সে দেখাবে না।

* * *

খবরের কাগজে অবিনাশের নিরুদ্দেশ সংবাদ সত্য হয়ে থাক। নির্মল তার ছেলেমেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করুক। অবিনাশকে ওরা যেন আর কখনও না দেখতে পায়। অবিনাশের রুক্ষ ঊষর জীবন-প্রান্তে সেই মধুর ডাকটুকু অক্ষয় সম্পদ।

হোটেলে পাশের ঘরের পাঞ্জাবীটি ডাকল "বাবুজী! খবরের কাগজটি একবার দেখতে পারি?" হাওয়ায় উড়ে যাওয়া পাতাগুলো গুছিয়ে অবিনাশ নীরবে খবরের কাগজখানা লোকটির হাতে দিয়ে দিল।

পর পর সাতটি পাত্রকে ইলা বাতিল ক'রে দিল।

বলা বাহুল্য যে প্রত্যেকেই যোগ্য পাত্র ছিল—তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের আগে ইলার পাত্রী হিসাবে দাবীর বহর কতখানি হওয়া শোভন সেটা দেখা দরকার বই কি। নইলে ত সকলেই পাত্র-পাত্রী নিয়ে ছেলেমানুষী করতে পারে। তাতে একমাত্র খাদ্য-মন্ত্রীরা খুশি হতে পারেন —নতুবা ডাক্তার থেকে ধোপা পর্যন্ত প্রত্যেকেই দেশে অবিবাহ-হেতুক জনবৃদ্ধি-নিরোধে বিরক্তি বোধ করবে, সে বিরক্তি থেকে ব্যবসায় সংকোচনও ঘটবে।

ইলার মাসতুতো দাদা নিরুপম একদা প্রচুর রাজনীতি ক'রে এখন কয়লা খনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বন্টনের হিসাব খতিয়ানের দু'শ টাকার কনিষ্ঠ করণিক, দু'শ টাকায় বিয়ে করা চলে না—অতএব সে অবিবাহিত বটে। কিন্তু সর্বশেষ পাত্রটি তারই নির্বাচিত, এবং সেইজন্য নিরুপম বোনের এই অব্যবস্থিত মতির জন্য রুষ্ট হয়ে বললে—"খুব ত মাতব্বরী করছ, নিজে তুমি কি এমন রূপের ধুচুনী? আমি হ'লে তোমার মত চ্যাংড়া মেয়েকে নাকচ ক'রে দিতাম।"

ইলা তার সুর্মা লাগানো আয়ত চোখ দুটি যথাসম্ভব নাচিয়ে বললে—"ইস, ভারি যে ঘটক সেজেছ দেখছি। এতই যদি ডিক্‌টেটরী মনোভাব তবে সোজাসুজি পাত্র ঠিক ক'রে দিন লগ্ন স্থির করে বিয়ে দাও, আমায় মিথ্যে পছন্দ করবার ঝক্কির দরকার নেই।"

—"তাই হওয়া উচিত। এইটুকু একরত্তি মেয়ে, তার কী বা বুদ্ধি যে—। জানো ওই অরুণ ছেলেটির কি উঁচু মন। তা ছাড়া ও হচ্ছে এক—"

"হীরের টুকরো,—এই ত। আমার হীরের টুকরোয় চেয়ে কাচের আয়না ভালো। অত দামী জিনিসে আমার কাজ নেই নিরুদা,. তার চেয়ে যে আমার নিত্য প্রসাধনে প্রয়োজনে লাগবে তাকেই আমি চাই।"

একটু বিচলিত হ'ল নিরুপম—তার পরিচয় পাওয়া গেল ঘন ঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়াতে। কলকাতার ঘনবসতি অঞ্চলের দোতলার ঘর

সন্ধ্যা বেলা এমনিতেই ধূমাচ্ছন্ন থাকে, তার উপর নিরুপমের এই ধূম সংযোগে ইলার দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম। ও বললে—"নিরুদা তুমি বিয়ে করছ না কেন?"

—"তার আগে তুমি আমাদের অব্যাহতি দাও তো—।"

—"তা বলে অরুণের মত গোবেচারী হীরের টুক্‌রো আমি গলায় বাঁধতে পারব না।"

—"তবে তুমি কি চাও? প্রত্যেকেরই একটা ক'রে খুঁত আবিষ্কার হচ্ছে—যথা, একজন গরীব, কি না বড্ড গরীব। আবার আর একজন যদি বা বড় লোকের ছেলে পাওয়া গেল, তখন বললে, ও কি নিজে রোজগার করে? বাপের পয়সায় যাদের নবাবী তারা মানুষই হয় না। বেশ, যখন—"

আলুলায়িত চুলগুলো দুহাতে সংগ্রহ ক'রে বাঁ কাঁধের পাশ দিয়ে সামনে টেনে এনে আনমনে বেণী বাঁধতে বাঁধতে ইলা বললে—"ও সব কথা বাদ দিয়ে বলো আজ সিনেমায় যাবে কি না। বড্ড সিনেমায় যেতে ইচ্ছে করছে।"

নিরুপম দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল—"সব সময় বাচালতা ক'র না, আমি আজ তোমার বিয়ের সম্বন্ধে চরম কথা জানতে চাই। কেন তুমি এমন ক'রে আমাদের ভোগাচ্ছো? সাত সাতটা ছেলের মধ্যে একজনও তোমার যোগ্য নয়, তুমি বলতে চাও? তোমার নিজের কি গুণপনা আছে? মধ্যবিত্ত ঘরের চলনসই মেয়ে, মোটে ম্যাট্রিক পাশ। পাত্র কি পাবে? থাকার মধ্যে তোমার আছে ত ওই রাঙা মূলোর মত রং—সুশ্রী তুমি মোটেই নও, গান গাইবার গলা নেই। টাকা দিয়ে একটা দামী বর কিনে দিতে পারবে এমন বাপও নেই। এই বেলা একটা বিয়ে করে নাও নইলে এর পর জুটবে না—"

তবুও ইলা এতটুকু মুখ ভার করল না। অকুণ্ঠ উচ্চ কণ্ঠের হাসিতে ও ঘরখানার ধোঁয়া যেন কাটিয়ে দিল, বললে—"বর না জুটুক—সখ ত মিটবে! যা সব ছেলের নমুনা দেখ্‌চি তাতে রুচি হচ্ছে না! তার চেয়ে তুমি আমায় একটা ইয়ো-ইয়ো কিনে দাও প্লাষ্টিকের।"

—"সেটা আবার কি?"

—"এই ত্মাখো, ওমা দেখনি বুঝি—হাত-লাট্টু যাকে বলে?"

—"ও বুঝেছি, সেদিন যেথি এম এ পড়ে একটা মেয়ে, সে কফি হাউসে বসে বসে ওই ইয়ে ঘোরাচ্ছে।"

নিরুপম অস্বস্তি বোধ করে। এ যেন কোন্ একটা হাল্কা পরিবেশ—হাল্কা জিনিস সে মোটেই সইতে পারে না। সেই জন্যে মোটা কাবুলী জুতো পরে সে, জীবনে নিউকাট জুতো পরতে ভরসা হয় নি তার। এও ঠিক সেই রকম লঘু আবহাওয়া, যেখানে কোনো কিছুই নির্ভরযোগ্য নয়। আজকাল ওর এই একটা নূতন মানসিক রূপ ধরা পড়ে নিজের চোখে—যা কিছু জাগতিক লঘুতায় খুশি তা সবই ওর কাছে নিছক অর্থহীন।

ইলা ডান হাতটা কচি খুকির মত ঘন ঘন নাড়তে নাড়তে, পা দুটোকে অস্থির আব্দারের ভঙ্গিতে মাটিতে ঠুকে ন্যাকা ন্যাকা স্বরে বল্লে—"আঁ—আঁ—আঁ তাহলে আমার জন্যে কেন তুমি আনবে না! এ্যাঁ—! আজকাল ত ইয়ো-ইয়ো একটা ফ্যাশন হয়েছে, সবাই—!"

—"যা ফ্যাশন, তাই কি ভালো? ট্রাশ!"

—"যা ভালো, তাই কি মানুষ করে? আর এটা তো খুব সস্তার ব্যাপার—"

নিরুপম বল্লে,—"আচ্ছা দেখা যাক কি হয়!"

—"এতে আবার হওয়ার কি আছে? তুমি দেবে কিনে, আমি ঘুরোবো। কি লাভ্লী! জানো নিরুদা, তিন নম্বর ফ্ল্যাটে কাল একটা বিয়ে হয়েছে, আমরা গিয়েছিলাম, বরের সঙ্গে আলাপ করতে। ইস্ কি বোকা ছেলেটা, আধুনিক গান গাইল রমলা—সেই যে 'আমি কি তোমায় চাহিয়া দেখিব মনের বুকের কোণে'—শুনে বল্লে কি না, মেয়েরা কি নির্লাজ! এমন ভাষায় বলা উচিত নয়! আচ্ছা তুমিই বলো না—গানের ভাষা ত কথার ভাষা নয়।"

নিরুপম উঠে দাঁড়াল, বল্লে—"তোমার সঙ্গে বসে বসে বক্লে আমার চল্বে না। আমি যাই, কাজ আছে।"

সেদিন আর কোনো কাজ হ'ল না নিরুপমের। সে সরাসরি বাড়ি ফিরল। এক দিক দিয়ে ভালোই হ'ল, কারণ বাড়িতে এসে দেখল মায়ের তেমনি জ্বর

এসেছে। হাত মুখ ধুয়ে সে যখন এসে বসল মায়ের কাছে তখন তাঁর কথা কইতেও কষ্ট হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যে কথাটা ওঠা খুব স্বাভাবিক সেই কথাই বললেন তিনি—"আর কতদিন বাবা, এবারে ছুটি দাও।"

নিরুপম নিরুত্তর।

পাশের ঘরে তার বাবা যেন দেওয়ালে কান পেতে বসেছিলেন, তিনি বলে উঠলেন—"তুমিও যেমন, মিথ্যে ব'লে মুখ ব্যথা করছ কেন? বিয়ে করা বৌকে যদি সংসারের পিছনেই লেগে থাকতে হয় তবে সে বিয়ে না করাই ভালো, এই যাদের মনোভাব তারা তোমার কথা কেন শুনবে?"

নিরুপমের ওষ্ঠপ্রান্তে একটা বক্রহাসির তীক্ষ্ণ রেখা ফুটে উঠল।

মা বললেন,—"তোমার ওই কথার ধকল আর কে সইবে বলো, আমি এক-এক সময় যখন নাচার হয়ে প'ড়ে তখন মুখ ফুটে বলি বিয়ের কথা, বলি দুটো অসহায় প্রাণীর কথা ভেবেই। কিন্তু তোমার যা বাক্যি যন্ত্রণা তাতে এই শম্মা ছাড়া আর কেউ এক দণ্ড তিষ্ঠোতে পারে সাধ্যি কি!"

কর্তা বোধ হয় ও ঘরে আর বসে থাকতে পারলেন না—তাতে দ্বন্দ্বের রস জমে না। বিশেষ ক'রে কর্তাব্যক্তিরা সামনাসামনি দাঁড়ালে যে প্রতিপক্ষ অনেকখানি খর্ব হয়ে কথা বলতে বাধ্য হয় এটা নিরুপমের পিতার ভালো ভাবেই জানা ছিল। তিনি ঘরে ঢুকে বললেন—"জ্বরের তাড়সে ত ধুঁকছ, তবু ঝগড়ার বেলায় দেখি বেশ মাথা সাফ আছে। এই ত শ্রীমান সামনেই রয়েছেন, উনি বলুন দেখি, কবে আমি তাঁকে সংসারের কুটোটি নেড়ে উবগার করতে বলেছি! যতক্ষণ হাড়ে-মাসে দেহখানা নড়ে-ফিরে বেড়াতে পারবে ততক্ষণ কাউকে আয়েস জোগাবার জন্যে ডাকব না। তুমি বলো তোমার গরজে, কিন্তু মিথ্যে ব'লে মুখ নষ্ট করতে যাও কেন। লেখাপড়া শিখে জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে এখন—আর কি বিয়ে করা সাজে!"

পিতার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা নিরুপম অপছন্দ করে। তাই চুপ ক'রেই বসে রইল। মাও বেশ ক'রে কাঁথা দিয়ে মুখটুকু পর্যন্ত ঢেকে পাশ ফিরে শুলেন। নিঝুম সন্ধ্যায় ঝিমন্ত ছোট্ট বাড়িখানার কয়েক মুহূর্তের মুখরতা যেন সুগভীর স্তব্ধতায় ডুবে গেল। আলম বাজারের সরু গলিতে এই বাড়ীখানা

বরাবরই নিস্তেজ—এই বাড়ীতে শিশু নেই, অনেককাল আগে কিশোর কিশোরী ছিল—নিরুপম আর অনুরাধা, ভাই বোন। অনুর বিয়েথা হয়ে গেছে অনেক দিন আগে। বড় লোক শ্বশুরবাড়ি—এঁদো পড়া এই যশার ডিপোতে বৌ পাঠিয়ে তারা বিপদ ডাকতে নারাজ। অতএব এ বাড়ীটা নিঝুম।...পিতাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে নিরুপম একটু খুশি হ'ল। ঢেউ কেটে গেছে। এমনি এক একটা ঢেউ আসে যখন ওর বাবা নিজের মনের সঞ্চিত উষ্মার উদ্গার তোলেন। তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যায়। সংসার চলে বৈরাগীর একতারার টুং টুং গুঞ্জনের মত।

একটানা ছন্দের বৈচিত্র্যহীন তান ছাড়া আর কিছু নেই এই একান্নবর্তী ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনে। তবু তো শান্তি আছে!

নিরুপম বল্‌লে—"আজ ও বাড়ি গিয়েছিলাম।"

—"কি হ'ল, ইলাকে না আজ দেখতে আসবার কথা ছিল?"

—"ওখানে হবে না বলেই মনে হয়।"

—"হুঁঃ! ও মেয়ে পার হওয়া সহজ নয়। আগেই বলেছি ওকে আদর দিয়েই ওর মা বাপ মাথাটা বিগ্‌ড়ে দিয়েছে। ওকে চাক্‌রী নিতে পরামর্শ দাও তোমরা। নইলে জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দাও।"

নিরুপমের পিতা সংসারের সব কিছু সম্বন্ধেই এক কথায় চরম নিষ্পত্তি ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকেন—ইলার সম্বন্ধেও ব্যতিক্রম ঘটল না।

নিরুপম মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌ল—"বার্লি খাবে? একটু ক'রে দিই ষ্টোভ ধরিয়ে।"

—"না বাবা এক বেলা উপোস দিলেই সব টেনে যাবে, আমার এ ভালুক জর। তেমন বুঝলে নিজেই ক'রে নিতাম, উনুনে ত আঁচ ছিলই।"

—"তুমি জর গায়ে রান্না ক'রেছ?"

—"তখন ত একটুখানি গা গরম হয়েছিল। আর রান্না ত ভা—রি ক'খানা রুটি আর একটুখানি তরকারী। এখন খাবি? দেবো।"

নিরুপম বড় অসহায় বোধ করে। এ যেন তার মায়ের মনোভাবটা তার নিজের মধ্যে রূপায়িত হয়ে উঠ্‌ল। যদিও সে নিজে হাতে গৃহস্থালীর

কাজ মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারে তবু তার মা যে তাকে কতদূর অপদার্থ এবং ছেলেমানুষ ভাবেন সে ত জানতে বাকী নেই। তিনি যখন জ্বরের মধ্যেও নিজে উঠে খাবার দিতে চাইলেন তখন তার মুখে আর কোন জবাব যোগালো না।

মা বললেন—"কী রে?"

—"অত ব্যস্ত হ'তে হবে না। আমি দেখে শুনে নিতে পারব।"

—"তাহলে আর ভাবনা ছিল না—খাওয়া ত হবে না ঠাকুরের ভোগ হবে নমো নমো ক'রে।"

নিরুপম হেসে জবাব দিল—"নাঃ, এবার একটা রাঁধুনী আনতেই হবে নইলে তোমার শান্তি নেই।"

—"না, না হাসি মস্করার কথা নয় বাবা। একটা কিছু ব্যবস্থা করো—।"

—"কিন্তু মা যেসব কাণ্ডকারখানা দেখি তাতে বিয়ের ওপর ভক্তি পিত্তি চটেছে। তোমরা ঘরে বসে থাকো পৃথিবীর কতটুকুই বা দেখতে পাও।"

তারপর সে ইলার কথা বললে সংক্ষেপে।...

সব শুনে মা ছোট একটি নিঃশ্বাসে অনেক অকথিত ভাব ব্যক্ত করলেন।

নিরুপম বললে—"আজ তাহলে আমি এ ঘরেই শুই, তোমার হয়ত রাতদুপুরে দরকার হবে।"

—"না তার দরকার নেই, এমন কিছু হয় নি যাতে জল গড়িয়ে নিতে পারব না। তোর আবার বেশি ভাবনা। তিরিশ বছরের বুড়ো খোকা, কত দিন মাকে আগলে রাখতে পারবি আর।"

নিরুপম হাসল—সে হাসি যেন কান্নার চেয়েও ঘন অন্ধকার—ঝাপসা।

এমন সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'ল।

সবাই অবাক। এ বাড়িতে এত রাতে কে কড়া নাড়ল? চার বছর আগে হ'লে হয়ত সম্ভব ছিল, নিরুপম এরকম সময়ে প্রায়ই আসত, কোনো দিন হয়ত এর চেয়েও বেশি রাত হ'ত তার।

ও ঘর থেকে বাবা সাড়া দিলেন—"কে?"

নিরুপম বেরিয়ে গেল—"আমি দেখছি।"

দরজা খুলে ও দেখ্‌লে মাসতুতো ভাই রমেন আর ইলা।

—"কি রে, কি ব্যাপার?"

রমেন এমনিতেই মুখচোরা, বিরাট পেশীপুষ্ট দেহের ঠিক বিপরীত হচ্ছে ওর স্বভাব। ইলা নিজেই বললে—"দাদা আর কতটুকু জানে, চলো ভেতরে চলো, আমিই বলব। শোনো, তার আগে তোমায় একটা কথা শিখিয়ে দিই দাদা,—মেসোমশাইকে তুমি বলো যে, হঠাৎ কুচবিহার থেকে খবর এসেছে, কালই মা-বাবা রওনা হয়ে যাচ্ছেন, দাদামশাইএর খুব অসুখ, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বলতে যেয়ো না যেন ওইসব প্রেমট্রেমের গল্প।"

রমেন কতকটা গোবেচারীর মত বল্‌লে—"আমি কিছু বলব না, তোমার দায় তুমি সামলাও।"

—"আচ্ছা বেশ তাই হবে ফোড়ন দিতে যেয়ো না তা'হলে।"

নিরুপম বিস্মিত যতটা হয়েছে তার চেয়ে বেশি বিরক্তই হয়েছে যেন। মায়ের অসুখ, তার ওপর আবার এই নূতন সমস্যার মত ইলা এসে জুটল।

দু'চার মিনিট পরেই উঠে দাঁড়াল রমেন—"এবার আমি যাই মাদিমা। ইলু রইল, ওটা খুব ফাঁকিবাজ, আপনি একটু ধমক দিয়ে কাজকর্ম করিয়ে নেবেন, এই অসুখ শরীরে একেবারে বিছানা ছেড়ে নড়বেন না।"

নিরুপমের বাবা ইতিপূর্বে একবার এঘরে এসে দাঁড়িয়ে পূর্বাপর বিবরণ শুনে গেছেন—"তাহলে The grand old man এবারে Balance sheet চুকিয়ে ফেলছেন। ও আর দেখ্‌তে হবে না, সেকালের মানুষেরা এমনি ক'রেই gloriously গেছেন। তা তুমি রমেন মাঝে মাঝে খবর নিয়ো ইলুর কষ্টটষ্ট হচ্ছে কি না।"

প্রয়োজনীয় কথাটুকু বলেই তিনি নিজের কোটরে ফিরে গেছেন।

ইলা বল্‌লে—"অযথা এতগুলো টাকা ট্যাক্সির পিছনে গেল, টেলিগ্রামটা যদি আর এক আধঘন্টা আগে পাওয়া যেত তাহলে আমি নিরুদার সঙ্গেই এসে পড়তাম। এখন আবার দাদাকে ট্যাক্সি করেই ফিরতে হবে।"

রমেন চলে গেল। নিরুপম নিজে হাতে ঠাঁই করছে দেখে ইলা ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল—"ও কি হচ্ছে? আমি আছি কি করতে?"

নিরুপম কুণ্ঠিতভাবে বললে—"আচ্ছা সে সব পরে হবে, তুমি কি আমার এ থেকে ভাগ বসাবে?"

—"না, আমি খাওয়াদাওয়া সেরে এসেছি। তুমি সরো, আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

নিরুপম কিছুতেই ছেড়ে দিল না ইলার হাতে খেতে দেওয়ার ভারটুকু।

সানুনাসিক কণ্ঠে ইলা নালিশ করল—"দেখুন ত বড়মাসিমা নিরুদার কাণ্ড!"

নিরুপম রান্নাঘরের সাম্‌নের দাওয়াতে খেতে বস্‌ল।

ইলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল—"এ তোমার খুব অন্যায় নিরুদা, আমাকে তুমি মোমের পুতুল ভাবো কেন?"

নিরুপম অন্য প্রসঙ্গ ধরল—"তারপর কী ব্যাপার বলো তো—!"

—"ব্যাপার আবার কি। ধরা পড়ে গেছি—ঠিক যে কেউ ধরতে পেরেছে তা নয়, ইচ্ছে ক'রেই ধরা দিয়েছি।"

—"তার মানে?"

—"তোমাদের আর অনর্থক হয়রান হতে না হয় আমি তাই চাই তুমি কিন্তু আমায় সাহায্য করবে!"

—"স্পষ্ট ক'রে সব বলো, বুঝি—তারপর—!"

—"এর চেয়ে আর কী বল্‌ব? আমি রণজিৎকে বিয়ে করব।"

—"সে কি করে?"

—"তুমি যেন জানো না? মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে, সেই যে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, আমার পরীক্ষার সময় রোজ খবর নিতে যেতো—মনে পড়ছে এবার? রণজিৎ আমার এক বন্ধুর দাদা। মেয়েদের প্রেমের ত দুটো পথ—হয় দাদার বন্ধু, না হয় বন্ধুর দাদা—!"

তরকারী দিয়ে রুটির roll পাকাতে পাকাতে নিরুপম বল্‌লে—"তা বেশ ত, আপত্তির কি আছে?"

—"তুমি বরাবর কেমন যেন এলোমেলো কথা বলো। আপত্তির যদি কিছু না-ই থাকবে তাহলে দাদা এই রাত দুপুরে আমাকে এই নির্বাসনে রেখে যাবে কেন? ওদের বাড়ির এক ও নিজে ছাড়া কেউ এ বিয়েতে রাজি নয়।"

—"তোমার সেই বন্ধুও নয়?"

—"না, সে প্রেমের ব্যাপারে সায় দেয়, কিন্তু বিয়ের কথা উঠ্‌লে বলে,—প্রেম হ'লেই বিয়ে করতে হবে তার কী মানে আছে। তোরা বড্ড হাল্কা—"

হাতের গ্রাসটা আর মুখে উঠল না, নিরুপম চিত্রার্পিতের মত ঠায় বসে রইল।

ইলা বল্‌লে—"আমিও এর আগে ভাবতাম, সত্যিই ত বিয়ের জন্যে একটা বিয়ে করা। আলাদা কথাই হওয়া উচিত। কিন্তু এই কিছু দিনের ব্যাপারে বেশ বুঝতে পারছি আমি যেন কিছুতেই ছাড়তে পারব না।"

—"রণজিৎ তোমাকে বিয়ে করতে পারবে বাড়ির অমতে?"

—"তা পারবে।"

—"তুমি ঠিক জানো?"

—"খুব জানি—সে বলে, চলে যেতে চায় আমাকে নিয়ে।"

—"দেখো, ও সব করবার ইচ্ছে থাকলে বলে দাও আগে থাকতে—"

—"পাগল হয়েছ! আজকাল পালিয়ে যাওয়া বা স্নুইসাইড্‌ করার রেওয়াজ চলে গিয়েছে—সোজাসুজি সকলের অমতে বিয়ে করতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হয়।"

নিরুপম হঠাৎ প্রশ্ন করল—"তোমার বয়স কত হ'ল ইলা?"

একটু অবাক হ'ল ইলা—"কেন? এই সতেরো আঠারো হবে। মানে বাবা মা তাই বলেন, সত্যি হচ্ছে কুড়ি।"

—"তোমাদের বয়সের প্রেমও যা, গরম কালের ঘামাচিও তাই। যখন হয় তখন অসহ্য—আবার সেরে গেলেও বেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে সেরে যায়। অনেক রাত হয়েছে, যাও মার ঘরে যে বিছানা হয়েছে তাতে শুয়ে ঘুম লাগাও পরম নিশ্চিন্তে।"

—"তুমি?"

—"আমার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

—"কিন্তু নিরুদা ঘামাচিও ত হয় মানুষের, তারও জ্বালা আছে।"

—"বুঝলাম সবই, তুমি তোমার রণজিৎকে বলো সে তার বাড়িতে জানিয়ে মত আদায় করুক।"

—"বলেছি অনেক বার তা সে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছে না।"

—"বাঃ, খুব বীর পুরুষ ত। এর ওপর ভরসা ক'রে তুমি সারাটা জীবনের দায়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে কি ক'রে আমি ত বুঝি না।"

ঘরের মধ্যে থেকে মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—"দুখানা রুটির একটি কুচোও যেন নষ্ট না হয়—আমি জ্বর গায়ে রান্না করেছি মনে থাকে যেন খোকা!'

—"না না, আমি সব সাবাড় করে দিচ্ছি। ইলু হ্যাংলার মত মুখের কাছে বসে দেখ্ছে, কিন্তু আমি একটুও দেবো না।"

আহার সমাধা ক'রে সে শুতে যাবার আগে মায়ের জ্বর পরীক্ষা করল।

ইলা বললে—"তোমার অত ভাবতে হবে না। কাল সকালে ডাক্তারকে মনে ক'রে একটা খবর দিয়ো।"

রাত্রে নিরুপম খুব নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারল না। মায়ের জন্য চিন্তাটা বড় সামান্য নয়। সাধারণ অবস্থায় যেমন উদাসীন থাকতে পারে নিরুপম, তেমনি সামান্য একটু কিছুতেই সে দুশ্চিন্তায় খেই হারিয়ে ফেলে। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই উঠে গিয়ে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে না হয় বিয়েতে সম্মতি দিয়ে আসে। কিন্তু যে কটা দিন মা অসুস্থ থাকেন সে দিনগুলির জন্যও চিন্তা কিছু কম নয়। কাল সকালে উঠেই শুরু হবে তার বাবার সঙ্গে নিঃশব্দ লড়াই। সংসারের সব কাজই সাধ্যমত করবে সে এটা ঠিক—কিন্তু তারই মধ্যে বাবা নিজের মর্জিমত একটা কিছু করতে যাবেন। ওদিকে হয় ত মা বিদ্রোহ করবেন—"আমার শরীর বেশ ভালো আছে বসে বসে দুমুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবো খুব! তুই ছেড়ে দে—।" কাজ করতে নিরুপমের কিছুমাত্র আপত্তি বা অসুবিধে হয় না, কিন্তু এর ওপর আবার ইলা এসে জুটেছে—এমনিতে একরকম না হয় সহ্য করা যায় কিন্তু কাজের ওপর সওয়ার হয়ে গোলমাল বাধাতে এলে নিরুপম চুপ ক'রে থাকবে না। ..আরও অনেকরকম চিন্তার প্রবাহ নিরুপমের অনিদ্র মনের আকাশে মেঘের মত জমা হ'ল সারা রাত ধ'রে;...মনে হ'ল জ্যোতির্ময়ীর কথা। বেশ ঠাণ্ডা মেয়েটি। খুব বিনীত, নম্র অথচ একটা

সজীবতার উত্তাপ যেন ওকে ঘিরে থাকে। অনেক পড়াশুনো অনেক গভীরতা জ্যোতির্ময়ীর মনের। নিরুপম জানে জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে ভাবসাম্য ঘটেছে তার।...

বাইরে থেকে মৃদু মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"নিরুদা, নিরুদা—ঘুমোচ্ছো?"

—"না, কেন?"

—"এমনিই, আমারও ঘুম এলো না কি না—তাই, একা-একা বসে থাকতে ভালো লাগছে খুব। তোমাদের এখানে কি চমৎকার চাঁদ ওঠে। চাঁদ কী সুন্দর—!"

—"চাঁদ সুন্দর কথাটা অনেক পুরনো। সত্যিই সুন্দর কি না সে কথা বিচার করি না আমরা, যাক গে যদি সুন্দরই হয় তাহলে কি উপায়?"

—"না উপায় কিছু ভাবছি না। ঘুম আসে না, চাঁদ ওঠে—তাই বলছি, তুমি কাল সকালে যখন ডাক্তারকে খবর দেবে তখন রণজিৎকেই খবর দিও, ফিয়ের খরচা বেঁচে যাবে।"

—"তুমি এখনই বিদেয় হও—"

—"অত সহজ নয় স্যার। রণজিৎ বড় ডাক্তার হবে দেখে নিয়ো।"

—"আগে হোক—তুমি যে ওকে পাশ করতে দেবে না!"

—"আশ্চর্য্য, তুমিও রাগ করছ? আমি যে তোমার ওপরই ভরসা করে এখানে এলাম।"

—"তুমি এলে না, তোমায় রেখে গেল।"

—"আরে আমি যদি আসতে না চাই ত আমাকে কেউ আনতে পারে?"

—"বুঝতে পারছি না।"

—"আরে আমিই কি আগে বুঝতাম, মাথা খাটালেই বোঝা যায়।' আগে জানতামই না যে আমি ওকে ভালোবাসি। পরীক্ষার পর শরৎবাবুর বই পড়লাম, তারপর শুনলাম রমলা ভালোবাসে অনিমেষকে, দাদা ভালোবাসে দীপাকে—এইরকম পাঁচজনের কথা শুনে বুঝতে পারলাম তাহলে আমি রণজিৎকে ভালোবাসি।...আজকের কথাই বলি, তুমি ওরকম হঠাৎ চলে

আসবে তা কি জানতাম! তাছাড়া দেখলাম তুমি তোমার ওই বন্ধুকে বাতিল ক'রে দেওয়াতে খুব চটে রয়েছ, নইলে ওখানেই সব কথা বলতে পারতাম। যখন তুমি চলে এলে, আমার মনে সত্যিই কষ্ট হ'ল—খুব অন্যায় করছি, সবাইকে এ রকম নাজেহাল ক'রে লাভ কি! তার চেয়ে আসল কথাটা ফাঁস ক'রে দিই না কেন? জানো নিরুদা, আমাদের বাড়ির সবাই যেন কেমন বেহুঁস—নইলে, ব্যাপারটা ত অনেক আগেই নজরে পড়বার কথা! আমিও চেষ্টা করেছি বহুবার যে এটা সবাই জানুক, এ নিয়ে একটা সোরগোল হৈ চৈ হোক।"

—"বাঃ, বেশ মজার আইডিয়া!"

—"না, তুমি বুঝতে পারবে না, একথা কেন মনে হয়েছিল—হয়েছিল বলছি কেন—এখনও মনে সেই রকম হচ্ছে। তা বুঝলে, আজ খুব সদরেই বেশ লুকোনো লুকোনো ভাব দেখিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম। কি ভাগ্যিস মা আমায় ডাকলেন,—'কী করছিস—।' ভাবো আজও যদি না ধরা পড়তাম তাহলে তোমাদের আরও কত কষ্ট ভোগ করতে হ'ত।"

—"মাসিমা বুঝি টের পেয়ে গেলেন?"

—"না, চট্ করে কি বুঝেছেন? আমি লুকোবার ভাণ ক'রে বললাম—'কই কিছু না ত?' তখন উনি বললেন—'এই যে এখন বসে-বসে কাকে চিঠি লিখছিলি? 'কাকে' আমি আরও বোকার মতই বললাম—'চিঠি? না ত!' মা অমনি আমার আঁচলের তলায় লুকোনো হাতখানা চেপে ধ'রে টেনে বার করলেন। তারপর চোখ বড় বড়—চাপা গলায় অনেক রকম মন্তব্য। আমার কিন্তু ভারি মজা লাগছিল—ভাগ্যিস, যা যা লিখতে চাই, আগে ভাগেই সব কিছু লেখা হয়ে গেছে।"

—"কি লিখেছিলে?"

—"একেবারে 'প্রিয়তম' দিয়ে শুরু ক'রেছি।—তুমি আর দেরি ক'র না। এখানে এ রা চক্রান্ত ক'রেছেন আমাকে ভাসিয়ে দেবেন। এই নিয়ে সাতবার আমি কায়দা ক'রে বেঁচে আছি। কিন্তু আর চলে না। তুমি অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করো। আর সব কথা—"

নিরুপম বিছানার ওপর সোজা হয়ে উঠে বসল—"বল কী।"
বাইরের দেওয়ালে ইলার হাসির অনুরণন চলল।

—"তারপর বুঝলে নিরুদা। সবাই খুব ঘাবড়ে গেল। এ রকম মেয়েকে ঘরে রাখা বিপদজনক। পাড়ার লোকের কান বাঁচিয়ে বেশ খানিকটা হিতোপদেশ দিতে লাগলেন মা। বকুনীর মাত্রা খুব বেশি হ'ল না, হয়ত বা সুইসাইডের আশঙ্কা করেছিলেন। ওঁরা যে অত ভয় করছিলেন কেন তা আমি বুঝতে পারছি না। যাই হোক, বাবা বললেন—'ওকে আর কাছাকাছি রেখে কাজ নেই।' আমি বললাম, 'বেশ ত দূর ক'রে দিন—' সে কথা শুনে বাবা যা রেগে গেলেন তোমায় কী বলব নিরুদা, কিন্তু আশ্চর্য হজম ক'রে নিয়ে বললেন—'অন্য বাপ হ'লে দূর করেই দিত! তোমার এ সব মতলব ছাড়ো। এই হচ্ছে শিক্ষার ফল—বাইরে বেরুতে দিলে এ ছাড়া আর কিছু হয় না! আমার মনে হয় এই আওতার বাইরে গিয়ে কিছুদিন থাকলে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে সব দেখবার সুযোগ পাবে তুমি।' আমি যেন মরীয়া হয়ে গিয়ে জবাব দিলাম—'বেশ তাই দাও, বড় মাসিমার কাছে জঙ্গলের মধ্যে ঠেলে দাও।'...আর যায় কোথায়—শুরু হ'ল তোমাদের গুণগান। তোমার মত ছেলে নাকি আর হয় না—তোমার সব ভালো,—বড় মাসিমার সব ভালো। দাদা বললে—'আর দেরি নয়।' কানে কানে কি সব বলাবলি হ'ল আমার শোনা নিষেধ। আমাকে সবাই যেন অন্য চোখে দেখছে—পর হয়ে গেছি।"

নিরুপম বালিশের তলা থেকে সিগারেট বার ক'রে ধরালে, তারপর বললে—"সব ত শুনলাম। তোমার বিস্ফুপনার শেষ নেই। কিন্তু তোমার আসল মতলবটা কি? তুমি সিরিয়াসলি ওকেই বিয়ে করতে চাও?"

—"সেই রকমই ত মনে হয়।"

—"ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করা সম্ভবপর হবে না তোমার পক্ষে?"

—"তা কি জোর ক'রে বলা যায়? ও যদি না পারে?—তার মানে, ওর পক্ষে যদি বিয়ে করা সম্ভব না হয় তাহলে ত হয় না।"

—"সে ক্ষেত্রে অন্য ছেলেকে তুমি বিয়ে করতে পারবে?"

—"অগত্যা।"

—"তাই যদি পারো তবে এত যাতায়াত কেন করছ ?"

—"সত্যি, কেন যে করছি নিজেই বুঝি না। এক এক সময় হাসিও পায়, আবার যখন কিছু করি তখন এই মনে হয় যে, আমি ঠিক করছি। সত্যি রণজিতের সঙ্গে তুমি মিশ্‌লে দেখ্‌বে সে কি ধরনের ছেলে। তার চোখের তারায় তারায় স্বপ্ন—একটা অসম্ভব কিছু যেন যেন ওর কাছে লুকোনো আছে। কথা বল্‌বার সময় ওর চোখের দিকে তাকালে আর কিছু মনে থাকে না, দীপক রায়ের মত ওর ঠোঁটের বাঁকা টান।"

—"দীপক রায় ?"

—"নতুন সিনেমা এ্যাক্টর—জানো ওর ছবির কন্‌ট্রাক্ট হয় আড়াই লাখ টাকা।"

—"ও।"

—"আমি এত কথা বল্‌ছি আর তুমি 'ও' 'হুঁ' ছাড়া কিছু বলছ না, বেশ।"

—"তুমি ত বল্‌তেই চাও।"

—"হ্যাঁ তাই চাই। তুমি কাল রণজিৎকে খবর দিয়ো কিন্তু।"

—"এসব শোনবার পরও তাকে খবর দেওয়া উচিত হবে ?"

—"তাহলে আমি কি করব ?"

—"বন্ধুর দাদার সঙ্গে প্রেম করবার সখ ত মিটেছে—এবারে দাদার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের আয়োজন হলেই যেন ভালো হয়।"

—"কিন্তু নিরুদা আমি যে তাহলে বাঁচব না।"

—"কেন এতে না বাঁচার কি আছে। আমি বলছি ত তুমি যাতে বাঁচো তার ব্যবস্থা ক'রে দেবো আমি।"

—"দোহাই তোমার। ওই অরুণটিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ো না—ও একটি স্বার্থ বোঝার মত, ওকে চোখ ফোটানো থেকে বুলি পড়ানো পর্যন্ত করতে হবে—সে আমার কর্ম নয়।"

—"বটে। এত দূর বুঝতে পারো মানুষকে দেখেই—।

—"না, তা পারি না। কিন্তু তেমন পুরুষকে কোনো মেয়েই নিতে চায় মানে যে মানুষ প্রেমকে চিনতে জানে না তাকে কে চায় ? ওই অরুণকে

আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে ভালোবাসত—কতদিন ধরে সেই মেয়েটিকে নাড়িয়ে গেল ভদ্রলোক, অথচ প্রেম বুঝতেই পারল না। এসব লোককে দেবচরিত্র বলে দূর থেকেই নমস্কার।"

—"তাহলে?"

—"এখন ঘুমোও।"

—"তোমার বিয়ের একটা বন্দোবস্ত না ক'রেই—"

—"আজই ত আর হচ্ছে না কিছু। ভয় নেই, আমি বোকার মত পালাবো না—জানো যারা পালায় তারা খুব ভুল করে। আমি একজনকে জানি—উঃ। সে থাক। তুমি ঘুমোও নিরুদা।"

ভোরের হাওয়ায় অনিদ্রার ক্লান্তি যেন দেহের রাজ্যে একটা নিদালির মায়া মাখিয়ে দিল।

নিরুপম যখন চোখ মেল্‌ল তখন বেলা হয়ে গেছে—চারিদিকে রোদ কট্‌ কট্‌ করছে। প্রথম কথা মনে পড়ল—মায়ের অসুখ। তারপরই সে ভাবল বাবা নিশ্চয় এতক্ষণে গামছা পরে গৃহস্থালীর কাজে লেগে গেছেন। তাকে দেখে বল্‌বেন—"কটা বাজল?" নিরুপম এক লাফে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। পরক্ষণে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। মাথায় রাজ্যের চিন্তা। মায়ের ওষুধ, পথ্য। বাবার আহারাদির কতকগুলি বিশেষ বন্দোবস্ত। আজ আর আফিস যাওয়া ঘটে উঠ্‌বে না—সে সম্বন্ধে পাড়ারই একজনের হাতে একখানা চিঠি লিখে দিতে হবে।

বারান্দায় পা দিয়েই সে দেখ্‌ল ইলাকে। প্রথমটা একটু যেন অবাক হয়ে গেল নিরুপম।

ইলা হেসে বল্‌লে, "উঃ কী সাংঘাতিক ছেলেমানুষের মত ঘুমোও তুমি নিরুদা। কতবার যে ডেকেছি।"

—"ইস বড্ড বেলা হয়ে গেল।"

তারপর চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিরুপমের বিস্ময়ের পালা আর যেন শেষ হ'তে চায় না।

—"তুমি এতখানি কাজ সব নিজে ক'রেছ ইলা?"

—"না, কী আর করেছি। এইটুকু ত একরত্তির সংসার।

—"বাবা?"

—"মেসোমশাই বাগানে।"

বাগান অর্থে ব্যাপক একটা আড্ডা। কাজ অথবা অকাজ একটা কিছু নিয়ে প্রাত্যহিক সকালটা সেখানেই বরাদ্দ।

—"তা হলে আমি বাজারে যাই অমনি ডাক্তারকে খবর দিই। তুমি একটু বিশ্রাম করো। আমি ফিরে এসে রান্নার ব্যবস্থা দেখ্‌ছি।"

—"খুব হয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে চা খাও—তোমার জন্যে আমার এখনও চা খাওয়া হয়নি। মাসিমার বার্লি নামিয়ে দিয়ে চা করি, কি বলো।"

নিরুপম রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ল—"না, না, আগুনের আঁচে তোমার গিয়ে কাজ নেই। আর তা ছাড়া বাবার ত সব রকম রান্না মুখে রোচে না—সে এক ফ্যাসাদের ব্যাপার।"

—"আচ্ছা থাক, আমায় উপদেশ দিতে হবে না। তোমারও যা পিট্‌পিটুনী, মশলা, নুন, ঝাল, তেল সব কম-কম দিতে হবে—মেসো মশাই-এর ঠিক উল্টো। মাসিমা স্রেফ বলে দিয়েছেন, বাপ-বেটার উত্তর দক্ষিণ ধারা, এক জনের খাওয়ার তাক পেলেই অন্যেরটা সহজে ধরা যায়। সে সব আমাকে শেখাতে এসো না।"

নিরুপম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না—এই একই ইলা? মুখে সে আর কিছুই বল্‌তে পারল না।

মা' শুধু বল্‌লেন—"তোর হাতে ত কত ভালো পাত্তর আছে, দে না দেখে শুনে বাবা। আহা, এমন মেয়ে যার ঘরে যাবে তার আর ভাবনা কিসের? কাল তুই যে অত কথা বল্‌লি, সব বাজে খোকা। ইলু ত খাশা মেয়ে। ছেলেমানুষ তোরা, কিছু বুঝিস নে, তোদের কেবল লড়াই সার।"

নিরুপম মনে মনে মায়ের কথা মেনে নিল, মুখে বল্লে—"ছাখো আগে ভালো ক'রে।"

—"আমার দেখা হয়ে গেছে রে। আজ শরীরটা ঝর্‌-ঝরে হয়ে গেছে, ইলুই জোর করে শুইয়ে রেখেছে, নইলে গা হাত ঠাণ্ডা পাথর!"

পাঁচ মিনিট আগে যে নিরুপমের মাথায় দুর্ভাবনার আকাশ ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল এখন ঠিক তার বিপরীত। হাতে কোনো কাজ নেই—ফাঁকা সময়টা যেন কাটানোর জন্য কাজ খুঁজে বার করতে হবে।

চায়ের কাপ হাতে ক'রে ইলা প্রবেশ করল—"ওমা, এখনও তোমার মায়ের আদর খাওয়া শেষ হয় নি! যাও মুখ ধুয়ে এসো শীগ্‌গির। মাসিমা, এ ক'টা দিন আপনি একটু রেখে ঢেকে আদর করবেন নিরুদাকে—আমি একজন সরিক আছি কিন্তু।—হ্যাঁ, আপনার বার্লি জুড়োতে দিয়েছি—নুন লেবু দিয়ে খাবেন, না দুধ চিনি দেবো!"

—"দুধ অত কোথায় পাবো মা?"

—"সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে, তাহলে দুধ-বার্লিই খান—একটু বলও হবে, কাল থেকে দাঁতে দাড়ি দিয়ে পড়ে আছেন ত।"

চা খেয়ে নিরুপম বাজারের থলি হাতে ক'রে বেরুলো। বাজার থেকে ফেরার সময় পথে মনোহারীর দোকানে ঢুকে একটা 'ইয়ো-ইয়ো' কিনে পকেটে ফেলে পরম নিশ্চিন্ত মনে বাড়িমুখো চল্‌ল। ইলা সত্যিই তাকে অবাক ক'রে দিয়েছে—ওকে শুধু হাত-লাট্টু কিনে দিলেই হবে না, বায়স্কোপও দেখাবে নিরুপম।

বাজার দেখে ইলা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলো—"দেখি তুমি কেমন গেরস্থ মানুষ।" থলির পরিধি ছাড়িয়ে একটি মোচার মাথা উঁকি দিচ্ছে দেখে ইলা বল্‌লে—"ও হরি, আজ মঙ্গলবার, মোচা তুমি আন্‌লে কি বলে?"

—"রাখো দেখি ভাই তোমার মঙ্গলবার! অন্যদিন সাতটার সময় বাজারে গিয়ে মোচা দেখ্‌তে পাই নে, আজ বলে পেয়েছি—হ্যাঃ!"

ঘরের মধ্যে থেকে নিরুপমের মা বল্‌লেন—"ওর ওই রকম।"

ইলা কি রান্না করছে—একটা কৌতূহল হওয়া নিরুপমের খুব স্বাভাবিক।

নিরুপম কিন্তু সে দিক দিয়ে গেল না। সে আস্তে আস্তে পকেট থেকে উপহারের বস্তুটি বার করে ঘোরাবার চেষ্টা করল বার কয়েক। অবশেষে হতাশ হয়ে সেটার আগাদ মস্তক সুতোর জোট পাকিয়ে নিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকল—"এই নাও তোমার ইয়ো-ইয়ো।"

ইলা হেসে উঠ্‌ল—"ইয়ো-ইয়ো কি হবে?"

ওর স-কলরব হাসিতে নিরুপম নিস্প্রভ হয়ে গেল—"বাঃ, কাল যে চেয়েছিলে?"

—"কাল চেয়েছিলাম বলে আজও চাইব? ওটা তুমিই ঘুরিয়ো—।"

—"কেন, তোমার কি অবসর মিলবে না?"

—"দেখ্‌চ না ওর চেয়ে কত ভালো আর বড় লাট্টু ঘোরাবার মওকা পেয়েছি। কাজ কিছু না জুট্‌লে তবেই ত হাত-লাট্টু ঘোরায় মানুষ!"

সেদিন আফিস থেকে ফেরবার পথে নিরুপম জোর ক'রে অরুণকে ধরে নিয়ে এল। তার বিশ্বাস যে ইলা অরুণ সম্বন্ধে সুবিচার করে নি—ইলার ভুল সে যেমন ক'রে পারে ভাঙবেই।

অবশ্য ভুল করা বা সংশোধনের কোন বাহ্যিক চেষ্টা কিছু পরিলক্ষিত হ'ল না। ইলা ওদের চা-জলখাবার দিল। এ বেলাও তার আব্‌দারেই নিরুপমের মা হেঁসেল ধরেন নি।

অরুণের লাজুক প্রকৃতিটা বয়সোচিত নয়—তবু স্বভাবকে সে অতিক্রম করতে পারে নি। সেটা সত্যি কথাই। সারাক্ষণে সে খুব কম কথাই বলেছে। ওরই মধ্যে একটা কথা যেন ওর মনের চেহারাটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখিয়ে দিল। নিরুপমের মা যখন বল্‌লেন—"তোমরা বাবা এবারে বিয়ে-থা করো। নিরুর একটি পাত্রী দেখে দাও, তুমিও করো।"

অরুণ তারই জবাবে বল্‌লে—"আমরা কেরানী, আমাদের কে বিয়ে করবে বলুন মা?"

অরুণ খুব বেশীক্ষণ ছিল না—তাকে আবার বেহালায় ফিরে যেতে হবে। নিরুপমের মায়ের অসুখের কথা শুনেই সে এসেছিল এতদূর।

সন্ধ্যার পর আজ সকলে মিলে অনেক গল্প গুজব করল। নিরুপমের বাবাও আজ যেন একটু খুশি আছেন।

কর্তার খাওয়া হয়ে গেলে, গৃহিণী স্বহস্তে নিরুপম আর ইলাকে বেড়ে দিলেন—"অনেক করেছিস মা—আমি নয় হাতে ক'রে ধ'রে দিই।"

—"তাই দিন নইলে আপনার ঘুম হবে না। কিন্তু আমাদের দিয়েই আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আর বসতে দেবো না। বাকি সব সেরে নেবোখন।"

রান্নাঘরের কাজ সারবার সময় ইলা বললে—"তুমি একটু থাকো নিরুদা, এত চুপচাপ যেন আমার ভয় করছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে ইলা রান্নাঘরখানা ঝক্-ঝকে করে তুলল নিরুপমের চোখের সামনেই।

নিরুপম বললে—"পারো সবই তাহলে!"

—"হ্যাঁ, মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি যখন তখন পারব না কেন?"

হঠাৎ আঁৎকে উঠ্‌ল ইলা—"নিরুদা, ওই কোণে তালগোল পাকিয়ে ওটা কি? সাপ?"

নিরুপমের মুখখানাও কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল—"সাপ? কই—!"

সে একটু এগিয়ে গেল, ঝুঁকে প'ড়ে দেখ্‌ল—তারপর সে যখন আরও এগুবার চেষ্টা করল তখন ইলা তাকে বাধা দিল—"অমন খালি হাতে যেয়ো না, দাঁড়াও একটা কিছু—"

নিরুপম হেসে বললে—"না, কিছু আন্‌তে হবে না। সাপও নয়, কেঁচোও নয়—ওটা সেই ইয়ো-ইয়ো। ছায়া পড়ে ওই রকম দেখাচ্ছে।"

ইলা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল—"উঃ কী ভয়ই পেয়েছিলাম, বাব্বাঃ! আমি ত নিজেই হাত লাট্টুটা রেখেছিলাম ওই জলচৌকীর পাশে! তারপর আর সারাদিন মনেই পড়ল না সে কথাটা?"

—"সারাদিন কী এত করলে যে তোমার ও সব মনে পড়ল না?"

—"অনেক ভেবেছি! এ রকম ক'রে আমি এর আগে কখনও ভাব্‌তে অবসর পাইনি নিরুদা। সব সময় যেন আর পাঁচ জনের সঙ্গে পা মিলিয়ে

চলাই এতদিন কাজ ছিল, কিন্তু আজ আমি বড় একলা হয়ে পড়েছি, তাই যেন ভাবতে হ'ল।"

—"কী ভাবলে?"

—"ভাবলাম আমার কথা, রণজিতের কথা—তোমার সেই বন্ধু অরুণের কথা। সকলের কথাই ভেবেছি। আচ্ছা নিরুদা, অরুণ খুব অভিমানী? আর আমি ওকে বিয়ে করতে নারাজ শুনে বুঝি খুব কষ্ট পেয়েছে—না? খুব চাপা মানুষটি, তাই নয়?"

—"যদি বলি যে, তোমার ধারণা ভুল।"

—"যাঃ, তা হ'তেই পারে না।"

ব'লে ইলা হাত-লাট্টুটা বেশ বাগিয়ে ধ'রে নিপুণতা সহকারে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘোরাতে লাগল।

নিরুপম বললে—"আমি ওকে বল্‌তে পারি নি যে তুমি ওকে বিয়ে করতে রাজি নও।"

—"তবে যে উনি বল্লেন, কেরানী মানুষকে কেউ বিয়ে করতে চায় না।"

—"এমনিই বলেছে। আর যদি বলেই থাকে তাতেই বা কি, ঠিকই ত বলেছে সে।"

ইলা ইয়ো-ইয়ো ঘোরানো বন্ধ ক'রে বল্‌লে—"চলো এ ঘরের কাজ চুকেছে, দুটো গল্প করা যাক।"

—"না, আমার ঘুম পেয়েছে।"

—"যাঃ, আবার ত যখন ডাকব সাড়া পাওয়া যাবে। তার চেয়ে আমি আজ যা ভেবেছি সেটা শোনো। তুমি অরুণকেই দু'চারদিন এখানে আনো, বাজিয়ে দেখি।"

—"ওসব চল্‌বে না।"

—"তবে কি চোখ বুজেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

—"হ্যাঁ, আমিও তাই বলি। তোমার ওই প্রেমের ব্যামোটি সেরে যাবে।"

—"হয় তো যাবে, নয় ত যাবে না—তাতে কার কি এসে যায়। তুমি

এ সবের কিছু বুঝবে না নিরুপম! আমাদের এই ঘরে ঘেরা জীবনের মধ্যে প্রেম যে কত বড় সম্পদ তা বলে বোঝানো যায় না।"

—"তাহলে তোমার রণজিৎ, প্রেমপত্র, কন্দীফিকির সব ছেড়ে দিতে রাজী আছো?"

—"অগত্যা! অগত্যাই বা বলি কেন? হয়ত এই বেশ ভালো হ'ল। একটা ছোট ঘরের মতই ব্যাপারটা—"

—"উঃ এত হেঁয়ালি বকছ কেন ইলু?"

—"হেঁয়ালি নয়! আমরা সব কিছুকেই ঘরের ছাঁচে ফেলি। তাখো, জীবনটাকে যদি সাজাতে চাও, তাহলে আসবাবপত্রেরও দরকার আছে—যেটা জীবনের ছবি আঁকলে কি পাচ্ছি তাখো। দু'একটা পরীক্ষায় পাশ করা, দু'চারটে গান জানা, একটু আধটু সেলাই ফোঁড়াই করা, এর সঙ্গে দু'একটা প্রেমে পড়ার স্মৃতি। তারপরের কথা—একটা স্বামী, দুটো ছেলেমেয়ে। বাস্—ফুরিয়ে গেল। জীবনটা সাজানোর জন্তে যেটুকু প্রেমে পড়া দরকার তা আমার হয়ে গেছে। একটা তোলপাড় করেছি বাড়িতে। এখন যদি বিয়ে ক'রে একটা স্বামী গ্রহণ করি—মন্দ কি। এরপর অবসর মত পুরনো প্রেমের গল্পটা নিজের মনের মধ্যে 'ইয়ো-ইয়ো'র মতই ঘোরানো যাবে। দিন যাবে, আর দিন কাটবে—যখন তেমন একঘেয়ে হয়ে উঠবে তখন স্বামীর মনের ঝাপ্‌সা আয়নার সামনে প্রেমের আধকাটা হীরের টুকরোটা ঠিকুরে দেবো। কেমন চমকে যাবে সে।

নিরুপম অবাক হ'য়ে গেল, বললে—"তোমার বুদ্ধি এত স্বচ্ছ হ'ল কি ক'রে? যেন অনেকখানি ভবিষ্যতের ছবি দেখ্‌তে পাচ্ছ।"

—"না ছবি ত দেখ্‌ছি না—ছবি আঁক্‌ছি। রঙ সংগ্রহ ক'রেছি অনেক রকম, এখন রসের দরকার। সারাজীবন ধরে আঁকব—নিজের জীবন দিয়েই, সংসারের পাতায় লতায় আঁকব।"

—"কি চাই বললে—রস না রসদ?"

—"ও দুটো আপেক্ষিক নয় কি? মনের রস আর দেহের রসদ। চোখের রঙ আর মুখের স্বাদ—এদের আলাদা ভাবতে পারো?"

এমন কিছু রূপসী মেয়ে সে নয়, তার চেয়ে বড় কথা—বয়সও খুব অল্প। হয়ত অনেকে বলবে বুড়ো বয়স পর্যন্ত ফ্রক পরিয়ে রাখলেই ত আর বয়সকে আটকে রাখা যায় না। হ্যাঁ, সে কথা খানিকটা সত্যি, প্রথমার বাবা-মা এখনও মেয়ের জন্য শাড়ীর ব্যবস্থা করেননি, তার বাবার বিশ্বাস, শাড়ী পরলেই মেয়েদের বয়স দশ বছর এগিয়ে যায়, পাকা পাকা কথা বলতে শেখে। আর মোটের ওপর ফ্রক পরলে মেয়েদের মানুষ ব'লে মনে হয়। শাড়ী পরে পুতুলের মত চলাফেরা করতে রীতিমত আয়োজনের দরকার হয়।...কিন্তু প্রথমার বাবার এ যুক্তি কেউ মানতে চায় না, বিশেষ করে যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই প্রথমাই নিজের সাজ-পোষাকের ওপর বীতশ্রদ্ধ। তা ছাড়া তার মন ফ্রকের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে অনেক দিনই। এখন ছেলেদের দেখলে তার কাছে বসে গল্প করতে ইচ্ছে করে আর লজ্জাও হয় এত যে পুরুষদের কাছাকাছি থাকে না, ভালো লাগে, তবুও না।

এত কথায় কাজ কি, একটি মেয়ে ফ্রক পরল কি না তা নিয়ে বেশি কথা বলতে গেলে হয়ত নিজেই ধরা দিয়ে বসব। সেদিনের ঘটনাটি বলি।

প্রথমার বড়দা'র বিয়ে—বড়দা মানে জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে। তাঁরা থাকেন বাহিরমির্জাপুরে। বিরাট বাড়ি জ্যাঠামশায়ের। মা পরে যাবেন, প্রথমা আগেই চলে এসেছে, বিয়ের ক'দিন আগে—অর্থাৎ পাকা-দেখার সময় এসে আর ফিরল না, এঁরা কেউ ছাড়লেন না।...কলমের এক খোঁচায় বিয়ের পর্বটা শেষ ক'রে দেওয়া যাক—বিয়ে হ'ল, খুব সুন্দর কনে, কনের ভাইকেও প্রথমার খুব ভালো লেগেছে। কথায় কথায় এ মনোভাব প্রকাশ পাওয়ায় তাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা-তামাসাও করেছে।

যেমন শুধু হাতে গিয়েছিল তেমনি শুধু হাতে ফিরল না কিন্তু প্রথমা। তার সঙ্গে ননদ-পুঁটুলীর একটা সুটকেস, তার চেয়েও বড় কথা এর মধ্যে খুব ভালো একখানা শাড়ী আছে। বড়দা'দের বাড়ি ছেড়ে প্রথমার আসতে ইচ্ছে করে না, ওখানে সবাই খুব ভালো, এত ভালো যে খোঁজ পর্যন্ত করে না কেউ

কারো। ও ত গেল স্বাধীনতার কথা। তা ছাড়া প্রথমা সেখানে আরও আনন্দে ছিল; তার শাড়ী পরবার সুযোগ—দিন-রাত একটার পর একটা পরো কেউ বারণ করবে না। তার মা বাড়ি থেকে জামা-কাপড় পাঠিয়ে দেবেন বল্‌তেই জ্যাঠাইমা বলেছিলেন,—'না ভাই, এই ক'দিনের জন্যে কোথায় কি হারিয়ে যাবে কাজের বাড়িতে দরকার কি, আমার মেয়েদেরও কাপড়-জামা আছে, তোমার মেমসাহেব মেয়ে দু'দিন না হয় রইল তাই প'রে কোনো রকমে।'

প্রথমার খুব ভালো লাগে। কেমন সবারই সঙ্গে অনেক কথা বলেন তিনি, মায়ের মত হাসি-গল্পে তাঁর কার্পণ্য নেই।

বাড়ি ফিরে তার ভারি বিশ্রী লাগে প্রথমটা, কি রকম ফাঁকাফাঁকা সারা বাড়িখানা। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে প্রথমা আবিষ্কার করলে যে, এই ফাঁকা-ফাঁকা ভাবটা খুব ভালো লাগছে ওর। অকারণেই আনন্দ হচ্ছে!' সারা দুপুর ঘর আর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ব'সে নানা ভাবে বড়দা'র বিয়ের কথা ভেবেছে ও—ভেবেছে জামাই বাবু, বৌদির ভাই, ওর জেঠ্‌তুতো ভায়েদের কথা, আরও এক জনের কথা। এই আরও এক জনটিকে সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না। বোধ হয় সারা জীবনেও না। বড়দা'দের পাড়ারই ছেলে, নাম নির্মল, ছিপ্‌ছিপে চেহারা মাজা-মাজা রং—এই ছেলেটি সর্বদা প্রথমাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে কথা ব'লে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করত, কথায় কথায় প্রথমার খুঁত ধরে টিট্‌কারি দিত। প্রথমার ভারি বিশ্রী লেগেছিল প্রথমটা, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, নির্মলদা যদি থাকত তবে এতক্ষণ কি রকম আনন্দে সময় কাটত। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথের লোক-জন যাওয়া আসা দেখে সে, মাঝে মাঝে কারুর জামার পিছন দিকটা দেখে ওর সন্দেহ হয় ওই বুঝি নির্মলদা চলেছে। আচ্ছা, হয়ত নির্মলদা এদিকে কোনো কাজে আসতেও ত পারে, আর কাজ না থাকলে এমনিও ত বেড়াতে আসে মানুষ। ওই দূরের নিমগাছের ছায়াতে দাঁড়িয়ে বরফওয়ালা বরফ বিক্রী করছে, তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্কুলের ছেলেরা ভিড় জমিয়েছে, আজ প্রথমার স্কুলে যাওয়া নেই, এমন বাড়ি বসে কামাই সে এর আগে কখনও করেনি। এক এক বার ভাবনা হয় স্কুলের পড়া এই ক'দিনে কত এগিয়ে গেছে। সব চেয়ে ওর ভয় অঙ্কের জন্য।

এমনি করে বেলা বিকেল গড়িয়ে গেল। আজ অনেক ভেবে প্রথমা ঠিক করেছে বিকেল বেলায় নতুন শাড়ী পরবে। নতুন শাড়ী পরার জন্য, তাকে অনেক আয়োজন করতে হয়। প্রথমতঃ ফাঁস দিয়ে শাড়ীর বাঁধন ঠিক রাখা তার আসে না, কেবলই মনে হয় কখন বুঝি কাপড় ছিলে হয়ে খুলে যাবে। সে জন্য জ্যাঠাইমায়ের ওখানে থাকতে কাদি দিয়ে বেঁধে শাড়ী পরত ও। আজ অবশ্য সেফ্টি পিন দিয়ে পরল। এগারো হাত প্রমাণ শাড়ী—ওর উজ্জল শ্যামবর্ণের সঙ্গে ধূপছায়া রঙের শাড়ী বেশ মানিয়েছে। হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমা নিজেকে দেখে অবাক্ হয়ে যায়। এ যেন অন্য মানুষ, প্রথমে সলজ্জ ভাবে নিজের দিকেও চাইলে, তার পর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আয়নার দিকে। এবারে বিশ্বাস হচ্ছে যেন দিদি'র মতই মেয়েলি ধরনের চেহারা ওর। সত্যি নিজের দিকে তাকিয়ে ও অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখল অনেকক্ষণ। আর সব বড় মেয়েদের মতই তার দেহের সুসমঞ্জস শ্রী ও ছন্দ ফুটে উঠেছে। ফ্রক পরা সেই মেয়েটির সঙ্গে এ মেয়েটির মোটেই মিল নেই।

একবার মনে হয় নির্মলদা'র কথা। ওর এলোমেলো শাড়ী পরার ধরন দেখে প্রথম নির্মলদা বলেছিল—মালকোঁচা ক'রে ধুতি পরলেই হয়!

আজ যদি নির্মলদা সামনে থাকতো কিছুতেই নিন্দে করতে পারত না, প্রথমা ভাবে। গাছকোমর বেঁধে অথবা মালকোঁচা ক'রে শাড়ী পরার চেয়ে কুঁচিয়ে পরাটা অনেক শোভন বই কি। মালকোঁচা ক'রে শাড়ী পরতে দেখেছে ও মাদ্রাজী মেয়েদের,—ওর মোটেই পছন্দ হয় না ওরকম কাপড় পরা।

বাবার ফেরবার সময় যত কাছিয়ে আসছে প্রথমা মনে মনে ততই সংশয়াপন্ন হয়ে উঠছে। এক-এক বার মনে হয় বুঝি বাবার কাছে খুব বকুনি খেতে হবে, কি জানি কি মনে করবেন তিনি। তার আগেই যদি শাড়ী খুলে ফেলে ও। পোশাক বদ্‌লে ফেলাই ভালো।...কিন্তু প্রথমার মন কিছুতেই সায় দেয় না। বাবাকে তার নতুন বেশ একবার দেখাবে। কি জানি কেন ওর ধারণা হয়েছে যে, বাবা দেখলে খুশি হবেন। খুশি না হবার কি আছে,—শাড়ী পরে সত্যিই প্রথমাকে ভালো মানিয়েছে। না, থাকগে, যেমন আছে তেমনি থাক, কিছু বলবেন না বাবা।

বিকেলে পথে লোক চলাচল বাড়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সঙ্কুচিত ভাবে ও চেয়ে থাকে রাস্তার দিকে। বিশেষ কোনো কাউকে দেখবার জন্য নয়, জনস্রোতের প্রবাহের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে প্রথমা। থেকে থেকে এক-একটা কটাক্ষে সে যেন কি রকম অস্বস্তি বোধ করে। মনে হয় বারান্দা থেকে এখনই স'রে দাড়াতে হবে ওকে, কিন্তু তবুও ঠিক স'রে যেতে মন সরে না। ও বুঝতে পারে না মনস্তত্বটুকুর ষোলো আনা রহস্য—।... এই ত সেদিনও এই বারান্দায় অসঙ্কোচে সারা বিকেল কাটিয়েছে কিন্তু এ-রকম অস্বস্তি হ'ত না। লোকেরা পথ দিয়ে যায়,—ওই ভদ্রলোক রোজ ছাতা বগলে ক'রে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যান, আরও কত লোক নিয়মিত এই পথ দিয়ে যায়, এদের অনেককেই ত সে চেনে! কিন্তু আজ সেই সব চেনা বা অচেনা মানুষেরা যেন নতুন হয়ে গেছে, একদম বদ্‌লে গেছে। এই বদ্‌লে যাওয়ার ভাবটা খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে প্রথমার চোখে। পৃথিবীটাই কি বদ্‌লে গেল!

কাপড় কেচে ওপরে উঠে মেয়েকে ব'সে থাকতে দেখে প্রথমার মা বললেন—আয় কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিই। মেয়েকে টিপ পরানো তখনও শেষ হয়নি এমন সময় জুতোর শব্দ পাওয়া গেল—হরনাথ বাবুর জুতোর আওয়াজ।

—কি রে দিদি এসেছিস? বলে তিনি সিড়ি থেকেই হাঁক দিলেন। প্রথমা তাড়াতাড়ি মায়ের কাছ থেকে ছুটে চলে যায়। ওর যেন কণ্ঠস্বর শুদ্ধ হয়ে গেছে। মুখে কিছু না ব'লে সোজা গিয়ে বাবাকে প্রণাম করলে। প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াতেই, হাসিতে হরনাথ বাবুর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আনন্দে তাঁর সারা দিনের কর্মক্লান্ত চোখ দুটি সহসা উজ্জ্বল দীপ্তিতে সজীব হয়ে উঠল।

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করবার লোভ অতিকষ্টে সংবরণ করলেন তিনি। এই ক'দিনের অদর্শনের পর আর আজ মেয়েকে যে কেন আদর করলেন না, সে কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পারবেন না তিনি। হঠাৎ যেন, মেয়েকে হাত ধরে কাছে টেনে নেবার কথা মনে হতেই কিসের সঙ্কোচ এসে পথরোধ করে দাঁড়াল। হরনাথ বাবু মেয়ের হাতে ছাতাটা দিয়ে প্রশ্ন করলেন—কখন ফিরলে?

প্রথমা জবাব দিলে—সাড়ে দশটা হ'য়ে গেল এখানে পৌছোতে।

আরাম-কেদারায় বসে তিনি মেয়ের দিকে আবার ভালো ক'রে তাকালেন, প্রথমা তখন অন্য দিকে চেয়েছিল। মেয়ের দিকে তাকিয়ে আপনার অজ্ঞাতেই বলেন—হুঁ!

প্রথমা বাবার দিকে ফিরে তাকিয়ে ব'লে—আমায় কিছু বলছ বাবা!

কপালের টিপটুকু পর্যন্ত নিখুঁত, সেই সেকালে এই ছোট্ট গোল টিপটাই অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে জেগে থাকত। এ চেহারা এত পরিচিত হরনাথ বাবুর, সে-কথা মনে পড়ে।

হাঁা ইয়ে, তোমার মাকে বল আজ চায়ে একটু আদার রস দিয়ে করে যেন, শরীরটা ঠিক ভালো বোধ হচ্ছে না।

মাথা ধরেছে বাবা? টিপে দেবো একটু? উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রথমা পিতার পানে চাইল।

পুনরায় হরনাথ বাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যান। প্রথমার প্রশ্নে উত্তর দেবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে অন্য কথা ভাবেন তিনি।...এমনি এক কোন্ সুদূর অতীত যুগে এক দিন হয়েছিল দেখা এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে, তার চোখেও তিনি দেখেছিলেন অবিকল এই প্রাণময় সজীবতা, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে কোথাও কি এতটুকু গরমিল নেই! আনন্দ-বেদনা-মুখর স্বপ্ন-কল্পনা খনিত সেই সুদূর অতীত যেন আজ এক মুহূর্তের জন্য সংশয় সঙ্কুচিত পদক্ষেপে চকিত দর্শন দিয়ে গেল। এ কী সেই মেয়েটি। মনোরমার সেই উচ্ছল যৌবনতরঙ্গ সেই যুগের এক যুবকের মনোতটে যে আলোড়ন তুলত সে-কথা আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল কিন্তু—।

হঠাৎ মাথায় একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব ক'রে হরনাথ বাবুর যেন খুব ভালো লাগে। তিনি বলেন, কে মনোরমা? পরক্ষণে পিছন ফিরে কন্যাকে দেখে তাঁর সারা দেহ কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

প্রথমা তাঁর কথার উত্তরে কি বলেছে তা যেন শুনেও শুনতে পান না হরনাথ বাবু।

কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক জোর দিয়ে হরনাথ বাবু বলেন, হাঁা মা দিদি, এ কাপড় কে দিল, জ্যাঠাইমা বুঝি। রংটি ত সুন্দর।

না বাবা, বড়দা'র শ্বশুরবাড়ি থেকে ননদস্বামীকে দিয়েছে।

মনোরমা এলেন চায়ের কাপ হাতে ক'রে,—হ্যাঁ গো তোমার শরীর খারাপ ক'রেছে তা শোও না মাথাটা টিপে দিই।

হরনাথ বাবু চোখ বুজেই বলেন, না থাক, লিলিও অবিশ্যি বল্ছিল। এমন কিছু নয়, সর্দিটা বসেছে কি না, ও একটু আদা-চা খেলেই সেরে যাবে।

হরনাথ বাবু ক্ষণেকের জন্য কন্যার দিকে তাকিয়ে একবার গৃহিণীর দিকে চাইলেন।

চায়ের কাপটা অনভিপ্রেত অতিথির মতই অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রইল, তিনি চোখ বুজে অবসন্ন দেহটাকে মেলে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন। কি একটা কাজে প্রথমা চলে গেল, মনোরমা রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মনোরমা একবার বল্লেন, চা জুড়িয়ে গেল যে গো।

ও। বলে হরনাথ বাবু গৃহিণীর দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। মনোরমা হাতটা ধ'রে বেদনাতুর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বলেন, ভাখো, একটা কথা বলবো?

বলো।

এবারে তুমি অবসর নাও, চাকরী করবার আর দরকার কি।

তাই ভাব্ছি। কিছু না ভেবেই বলেন হরনাথ বাবু।

আর কতকগুলো খেটেই বা কি হবে। টাকাটাই ত সব নয়, আমাদের জীবন এতেই কেটে যাবে, মেয়ের জন্যেও ভাবনা নেই, সাতটা নয় পাঁচটা নয়, ওই একটিই ত।

ঠিক কথা।

এবারে মনোরমা স্বামীর অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলেন, তোমার ওই এক কথা। দেখছো মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে?

এ কথার প্রতিবাদ করতে মন সায় দেয় না, তবু হরনাথ বাবু জোর করে বলেন, আজ তোমার ওপর আমি বিরক্ত হয়েছি। কি দরকার ছিল শুনি—

কেন? মনোরমা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

মিছেমিছি মিথ্যিকে এক চাউস শাড়ী পরিয়ে দিয়ে জবরজং করে তুলেছ ওকে।

মনোরমা রীতিমত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, জবরজং? কি যে বলো তুমি, দিন দিন তোমার ভীমরতি হচ্ছে যেন। শাড়ীখানা প'রে কি চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে, আমি চেয়ে চেয়ে চোখ ফেরাতে পারি না। ঠিক কি মনে হচ্ছিল জানো? বিয়ের পর পর আমিও ওই রকমই দেখতে ছিলুম গো। আজ বিকেলে হঠাৎ ওকে শাড়ী পরা দেখে আমার মনে হ'ল কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিলে তুমি অবাক্ হয়ে যাবে।

মনোরমা আশা করেছিলেন, স্বামীর মুখেই মেয়ের প্রশংসা শুনবেন। তাঁর মনের প্রায় অজ্ঞাত লোকে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের শাণিত অস্ত্র হয়ত বা অপেক্ষা করছিল এই পরিয়ে দেওয়ার আড়ালে। হয়ত বা মনে হয়েছিল সেই অগ্নির কিছু অবশিষ্ট আছে কি না একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবার। হয়ত বা হয়নি কিছুই, শুধু ভালো লেগেছিল বলেই তিনি মেয়ের কপালে সেই অগ্নিশিখার মত টিপ এঁকে দিয়েছিলেন।

হরনাথ বাবু মনে মনে বলেন, বিয়ের পর ওই রকমই ছিলে তুমি দেখতে। হ্যাঁ তা হবে। ইচ্ছে হয় বলেন, 'না, এর চেয়ে বোধ হয় দেখতে ভালই ছিলে।' কিন্তু স্তাবকতা করতে মন সরে না।

মনোরমা নিজেই সত্য কথাটি বলে দিলেন, যাই বলো, দিদি কিন্তু আমার চেয়ে দেখতে সুশ্রী হয়েছে।

এ কথারও জবাব দিতে হরনাথ বাবুর কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হয়, সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ানো মেয়েটির ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে তাঁর বেঁধেছিল।

তিনি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলেন, থাকগে চা আর খাবোনা, ঠাণ্ডাতে বসি।

মনোরমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেন, কেন আমি কি মরে গেছি, এক কাপ চা-ও করে দিতে পারব না? বলেই তিনি হাঁক দিলেন, দিদি,—

যাই মা। বলে সাড়া দিলে প্রথমা।

সেই সন্ধ্যারাগের ঘনায়মান অন্ধকারে কোন্ সুদূর পল্লীতে ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে এক দিন গিয়েছিলেন হরনাথ বাবু, সেই কথা মনে পড়ল।

প্রথমা কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি নিজেই বল্লেন, আজ দেখি তুই কেমন চা করতে পারিস্।

মনোরমা বাধা দিয়ে বল্লেন, থাক্ এক কাপ ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, এবারে অখাদ্য খেয়ে আর কাজ নেই, ও তুমি মুখে তুলতে পারবে না।

প্রথমা বাবার কথা শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল, মায়ের বক্রোক্তিতে সে মোটেই দমল না, বল্লে, দ্যাখো না মা, অমনি করে আমার কাজ শেখা হয় না?

হরনাথ বাবু গৃহিণীকে চেয়ারের হাতলের উপর জোর ক'রে বসিয়ে বল্লেন, আজকাল যেন তোমার ওই কাজ ছাড়া আর কিছু নেই, কেন একটু বিশ্রাম নিলে কি হয়?

হরনাথ বাবু মনে মনে স্থির করে ফেল্লেন, প্রথমাকে শাড়ী পরতে বারণ করবেন, আগে যেমন সে ফ্রক পরত তেমনই পরুক। হাঁ, এখনই বারণ করা দরকার।

তিনি ডাকলেন মেয়েকে, দিদি শোনো।

প্রথমা এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে নব জীবনের প্রভাত-দীপ্তিকে কোনো আঘাতেই ম্লান করে দিতে মন সরে না হরনাথ বাবুর।

মনোরমা চুপ করে বসেছিলেন এতক্ষণ, একটা কথা মনে হয়ে গেল, তিনি বল্লেন, হাঁ্যা রে, নতুন শাড়ী প'রে খুব ত ফুর্‌ফুরিয়ে বেড়াচ্ছিস, বাপ-মাকে নমো করতে হয় তা বুঝি মনে নেই।

প্রথমা মুখে বলে না যে সে পিতাকে সর্বাগ্রে প্রণাম করেছে, সোজা গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে চুম্বন করলে মাকে। কোন দিন সে মাকে প্রণাম করেনি, করতে তার ভালো লাগে না, জিজ্ঞাসা করলে বলে ও—তোমায় প্রণাম করতে গেলেই ভয় হয় তুমি বুঝি মা ম'রে যাবে।

হরনাথ বাবু সেইদিন থেকে প্রথমার শাড়ী পরা মেনে নিয়েছেন। ফ্রক সে আর পড়ে না।

পাহাড়ের গায়ে অস্তসূর্যের রক্তিম আলো, কিন্তু সবুজ কুয়াশার মত দেখাচ্ছে। বিকেলের এই শান্ত মূর্তিটা অনেক দিন পরে ফিরে এসেছে শক্তি-ময়ের জীবনে—কত দিন পরে তার হিসেব মিলবে না।

একটা কালো ফিতেকে কে যেন হেলায় ছুঁড়ে দিয়েছে ওই পাহাড় পর্যন্ত। ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছে পথটা—কিন্তু কোথায়? ওখানে কি আছে শক্তিময় জানে না। জানবার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। এত দিন যা দেখেছে, যা বুঝেছে, যা সে জেনেছে সব কিছুই ত ভুল। আরও জানা ত অকারণ ভুলের সঞ্চয় ভারী করা।—না থাক, আর কিছু জেনে কাজ নেই। একখানা সাইকেল আর একটা ক্যামেরা—দুটোই অপ্রাণীবাচক, কিন্তু সঙ্গী হিসেবে আশ্চর্য রকমের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাজ করছে, শক্তিময় এদের দু'জনকে পেয়ে যেন বাকী জীবনের খোরাক এবং রসদ কিনে নিয়েছে।

পথের পাশে অজস্র পলাশ ফুটেছে। রামগড়ের হাট থেকে বিকিকিনি সেরে ঘরে ফিরছে দলে দলে দেহাতী পুরুষ ও রমণী।

শক্তিময় সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। পাশের জঙ্গলে একটা মহুয়া গাছের গায়ে সেটা ঠেসান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বাঁকের মুখে দাঁড়াল. কাছেই একটি বৃদ্ধা ভুঁইয়ে বসে বসে কি যেন করছে। শক্তিময় তার কাছাকাছি গিয়ে দেখল, বুড়ি কাপড়ের আঁচল ভর্তি ক'রে ঝ'রে-পড়া পলাশ কুড়িয়েছে।

অন্যমনস্কভাবেই সে বল্‌লে—ঝরা ফুল দিয়ে কি হবে গো বুড় মা।

বৃদ্ধা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল, তার কুড়োনো ফুলগুলো ঝুর-ঝুর ক'রে পড়ে গেল মাটিতে। শক্তিময় বৃদ্ধার ভয়ার্ত দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে একটু বিস্মিত হ'ল। সে বললে—"ক্যা মাঈ, ডর লাগা?"

—হাঁ বেটা। বৃদ্ধার সরল উক্তি, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা কম্পিত কয়েকটি কথা। কিন্তু এতেই শক্তিময় বিচলিত হয়ে পড়ল। আহা বেচারী কতক্ষণ ধ'রে একটি-একটি ক'রে ঝরে-পড়া পাপড়িগুলো সংগ্রহ ক'রেছিল—কি জানি কেন? হয়ত মৃত কোনো ব্যক্তির স্মৃতি দিয়ে উদ্‌বুদ্ধ ওর মন। আরও একটা কথা—

সারা বছর ধরে পলাশ যে শ্বপ্নসঞ্চয় ক'রেছে, যে জীবনীশক্তি গাছের মর্মে রসসঞ্চার ক'রেছে তার পত্র-পল্লবে সব কিছু উজাড় ক'রে দিয়েই ওই রক্তপলাশ ফুটেছিল। সূর্যের পিপাসা জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ নরম মদিরা সব কিছু ওই পাপড়ি-গুলোর বুকে রয়েছে তাই বুঝি ওই বুড়ি একটি-একটি ক'রে কুড়িয়ে তুলছিল। বৃদ্ধার দিক থেকে শক্তিময়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল পলাশ-গাছটার দিকে—আহা, একটিও পাতা নেই, সবগুলোই কি ফুল হ য়েে পড়েছে ঝ'রে?

বুড়ি বললে—কি দেখ্‌ছ বেটা?

—কিছু না, তোমার সব ফুল যে পড়ে গেল মাঈ?

—তার জন্যে কিছু না। আবার কুড়িয়ে নেবো। যা ভয় পেয়েছিলাম—মনে হয়েছিল বুঝি পল্টনের লোক আমাকে ধ'রে নিতে এসেছে।

পাশেই মিলিটারী আস্তানা, সেই দিকে একবার তাকিয়ে বুড়ি আবার বসে গেল ফুল কুড়োতে। শক্তিময়ও তাকে সাহায্য করতে লাগল।

বুড়ি বললে—না বাবা তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। রাজার দুলাল তুমি কেন মাটিতে বসে আমার জন্যে কষ্ট পোয়াবে?

—তাতে কি হয়েছে। আমার জন্যে তোমার সময় নষ্ট হ'ল যে—

করুণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সময় আমার বড্ড বাড়তি হয়ে পড়েছে বাবা। বুড়ো মানুষ, কাজ খুঁজে পাই নে—

শক্তিময় প্রশ্ন করলে—এ ফুল নিয়ে তুমি কি করবে?

অসহায় ভাবে বৃদ্ধা আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—এ হচ্ছে রোদ-লাগার ওষুধ। এই ত সামনে গর্মিকাল আসছে—কত লোকের সর্দিগর্মি হয়, রোদ লেগে জর হয় তখন কত উপকার হয়।

শক্তিময় বললে—এখন ত ফাগুন মাস—

বৃদ্ধা হাসলে, দাঁত নেই ওর একটিও, 'ভারি মিষ্টি হাসি'। মাথার শাদা-শাদা চুলগুলোর মত পবিত্র চকচকে ওর হাসি, নিরুত্তাপ। বললে ও, এখন থেকে না কুড়িয়ে রাখলে তখন পাবো কোথায় বেটা? তখন ত পলাশ ফুট্‌বে না। সব পাতা হয়ে যাবে—ছায়া দেবার চাকরী করবে গাছেরা। তখন কি আর ফুল-ফুটিয়ে সেজে বসে থাকবার সময়?

—আচ্ছা বুড়ি মা, তোমার কে আছে?

—আমার? এই তোমরা আছো বাবা, আর কে থাকবে। আর খোদা আছেন।"

দুই বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল বৃদ্ধার কুঞ্চিত লোল গণ্ডদেশ বেয়ে ঝরা-পলাশের পাপড়ির মত।

শক্তিময় সরে এল—এখনই হয়ত দুঃখের ইতিহাস তার ভারী মনকে আরও ভারী ক'রে দেবে। সে আর দুঃখ পেতে চায় না—না, সুখেও তার কাজ নেই। হৃদয়াবেগের কোনো ফলাফলই তাকে যাতে ছুঁতে না পারে এমনই একটা মানসিক স্তরের সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়েছে।

ভালোবাসা? না, তারও প্রয়োজন নেই। সে ত ভালোবাসা পায়নি এমন নয়, কণিকা তাকে সব কিছু দিয়ে ভালোবেসেছিল। কিন্তু শক্তিময় তা নিতে পারেনি। নিতে পারেনি তার কারণ সে জানে,—গ্রহণ মানে ত শুধু নেওয়াই নয়, দিতে হবে। সে দেওয়া সব সময়ে যে আয়ত্তের মধ্যেই থাকবে এমন নয়, দাসত্বের শেষ বিন্দু পর্যন্ত দিয়েও হয়ত দাবির চাহিদা নিঃশেষে মিটবে না। অসম্ভব। নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে ভালোবাসা কিনতে পারবে না শক্তিময়—তাই এই পলায়ন। কণিকার চাহিদা কতখানি ছিল তা শক্তিময় বুঝতে পারেনি, চেষ্টাও করেনি—তবে আজ মনে হচ্ছে কণিকা তার জীবনকে ভরপুর ক'রে দেবার জন্যে নিজেকে উজাড় ক'রে দিতে প্রস্তুত ছিল। নইলে আত্মহত্যা করতে পারত কি?

পাহাড়ের পথে-পথে জীবনের পদচিহ্ন দেখবার নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দেবে শক্তিময়। তার আশা আছে-একটি নির্ভুল ছবি তুলে এই পৃথিবীকে উপহার দিয়ে যাবে। বিধাতার সৃষ্টিতে অনেক ভুল আছে—নইলে কেন এত বেদনা, কেন এত দুঃখ, কেন এত দৈন্য! শক্তিময়ের সাধনা হবে তার ব্যতিক্রম—নির্ভুল সৃষ্টির।

দূরে এসে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে ক্যামেরাটা চোখের সঙ্গে লাগিয়ে সে পরখ করতে লাগল—ওইখানে বুঝি নির্ভুল ছবির খোরাক ছড়ানো রয়েছে। মনে হচ্ছে যেন হাতছানি দিয়ে পাহাড়ের শ্যামল শাল-মহুয়ার বনেরা ডাকছে শক্তিময়কে।

সাইকেলখানাকে অবহেলা ভরে আকর্ষণ করল সে। তারপর চড়াই-এর দিকে উঠতে লাগল। তার পায়ে জোর আছে—অনেক অনেক দূর পর্যন্ত চড়াইতে সাইকেল ঠেলে উঠে যেতে পারবে। নির্ভুল চিত্র দিয়ে পৃথিবীর বুকে যুগান্তর আনবার ব্রত নিয়েছে যে, তাকে এটুকু কষ্ট করতে হবে বই কি।

মাইল দুই চলে আসবার পর শক্তিময় দেখলে সামনে চড়াই একেবারে খাড়া ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে সে নামল। পিছনের দিকে দৃষ্টি পড়তে অবাক হ'য়ে গেল—পশ্চিম আকাশে কে অত সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে—কামনার চেয়েও কি গাঢ় লাল ওই রঙের রক্তিমতায় নেই! শক্তিময় অসহায় ভাবে ক্যামেরার দিকে তাকাল—ওই রঙ কি তুমি ধ'রে দিতে পারবে, চিরকালের পৃথিবীকে সব সময়ের জন্য? পরক্ষণে মনে হ'ল—কই বিস্ময় ছাড়া বেশি কিছু ত নেই ওই রক্তিমতায়। তবে কেন এই নাটকীয়তার প্রতি তার মমতা। থাক, ও ছবি আকাশই দিন দিন এঁকে চলুক আপন মনে—শক্তিময় তুলবে না ও-ছবি।

ওপাশের জঙ্গলে যেন কিছু একটা হেঁটে বেড়াচ্ছে। পায়ের শব্দ—ঝরা পাতার ওপর চলমান প্রাণীর পদক্ষেপ বনের স্তব্ধতায় একটা মর্মরধ্বনি জাগিয়ে তুলল। কোনো জানোয়ার হবে? হিংস্রও হতে পারে। শক্তিময়ের মনে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হ'ল না। সে যে নিরস্ত্র এ কথাও ভাবলে না সে।

মিনিট কয়েক ধ'রে সেই শব্দ শুনেছে হয়ত—এক সময়ে মিশ কালো একটি মানুষ বেরিয়ে এল, তার ঘাড়ে একখানা লাল গামছা, পরনের ধুতিটা মালকোঁচা দেওয়া, অনাবৃত দেহ।

শক্তিময়কে দেখে সে আকুল ভাবে প্রশ্ন করল—ঘোড়াটা দেখেছ বাবুসাহেব?

শক্তিময় বললে—না ত!

শক্তিময় ছবি খুঁজতে ব্যস্ত—কোনো ঘোড়া দেখে থাকলেও লক্ষ্য ক'রে দেখবার নজর তার ছিল না। অতএব সে দেখেনি।

লোকটি বললে—আজ সাত দিন হ'ল আমার সেই লাল ঘোড়াটা হারিয়েছে—আজ পর্যন্তও পেলাম না। যদি দেখতে পাও ত আমায় একটু খবর দেবে?

কালো চেহারার ওপরেও যে বিষণ্ণতা একটা মালিন্যের ছাপ এনে দেয় শক্তিময় এই লোকটিকে দেখে যেন নতুন ক'রে অনুভব ক'রলে।

লোকটি সাগ্রহে তার হারানো ঘোড়ার রূপ বর্ণনা করতে লাগল—মাথার ঠিক মাঝখানে শাদা চক্র। পেটের ডান দিকে গাঢ় বাদামী আর শাদাতে মিশে গেছে—আর সবচেয়ে লক্ষণীয় লেজের সবটুকু দুধের মত ফর্সা শাদা। এমন ঘোড়াকে কেউ বেশি দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

শক্তিময় ঘাড় কাৎ ক'রেই অনাসক্ত ভাবে উত্তর দেয়—আচ্ছা দেখ্‌ব।

লোকটি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়, সে বললে—সাত দিন আগে রামগড় বাজারের কাছে আমাদের তাঁবু পড়েছিল। সেদিন ওই রাঁচি-হাজারীবাগ রোডের ওপাশে আরও সবগুলো ঘোড়ার সঙ্গে গিয়েছিল বেটা, কিন্তু সবাই ফিরল তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেলনা। তারপর রোজই খুঁজি—তাকে পাই নে। ' দিন তিনেক আগে এক পল্টনের লোক বলেছিল যে, কোন্ একটা মাদী ঘোড়ার সঙ্গে এই পাহাড়ের কোলে সে ওই ধরনের একটা ঘোড়াকে যেন চরতে দেখেছে। তার কথা শুনে আমি রোজ যতখানি পারি পাহাড়ের কোলে কোলে খুঁজে বেড়াই।

শক্তিময় বললে—এ ভাবে খুঁজলে কি আর পাবে?

—না পেলে আর কি করব বলুন? পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়েছিলাম। তা আপনাদের আশীর্বাদে বৃন্দাবন, মথুরা, কাশী, গয়া হয়ে গেছে। এখন যাচ্ছি বৈদ্যনাথ। মোট মাটারী নিয়ে চারটে ঘোড়ার খুব যে কষ্ট হবে তা নয়। তবে ঘোড়াটা পথে পড়ে থাকবে—এই যা ভাবনা। দেখি আর দু'চার দিন।

—তোমার নাম কি?

—লছমন। আমার দাদা রামঅবতার—আমরা 'পাঁচ ভাই'। ক্ষেতিউতি আছে। কিন্তু বাবু আপনি একটু ঘোড়াটা দেখবেন—যদি পান একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন না হয়—বড়কাখানা জংশনের কাছে আমাদের ওই একটাই তাঁবু আছে। গাড়ীভাড়া যাতায়াত দেবো—খবরটা যদি দয়া ক'রে জান।

হেসে উঠল শক্তিময়—আচ্ছা ভাই, খবর পেলে দেবো।

লছমন ট্র্যাক থেকে একটা দেশলাই বার করলে—ছোট একটি বিড়ি বার ক'রে শক্তিময়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—লিজিয়ে।

—আমি খাই নে।

—আচ্ছা বাবু, এখন বড়কাখানার গাড়ি পাবো?

—খুব পাবে—সন্ধ্যের সময় ত ট্রেন।

—অতক্ষণ কে বসে থাকে, এই ত চার মাইল পথ, দেখতে দেখতে চলে যাই। যদি পথের মধ্যে কোথাও ব্যাটাকে পেয়ে যাই। তবে কি জানেন—ব্যাটা একটা ঘুড়ীর সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে কি না, এখন ওকে খুঁজে পাওয়াই দায়। বাড়ির কথা কি মনে আছে আর? এই যে লছমন ছত্রী কত ছোলা হাতে ক'রে খাইয়েছে তার কথা কি একবারও মনে পড়বে বেইমানের?

শক্তিময় হাসলে।

লছমন শেষ বারের মত কাকুতি-মিনতি ক'রে বলে গেল—খবরটা যে পাই বাবু। আমি বলি কি বৈজ্‌নাথজী ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, দু'দিন পরেই যদি যাই ত কি ক্ষতি—একটা দুটো চারটে দিন ভালো ক'রে খুঁজলে চুমকীকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দাদাটা মহা ব্যস্ত—বলে, চল কালই সকালে।

—ঠিক কথা, ঈশ্বরের পালাবার কোনো পথ নেই। মানুষের দাসত্ব ক'রে যাবেন তিনি, যত দিন কোনো সুলতান মামুদ, আলমগীর, কোনো আবদালী এসে তাঁকে মুক্তি না দেয় তত দিন তিনি বসে থাকবেন! তাঁর ত আর লছমনের ঘোড়ার মত চারটে পা নেই।

লছমন নির্বোধের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—আপনি কি বলছেন বাবুজী?

—তোমার দাদা ভারি ছট্‌ফটে লোক, তাই ভাবছি—

—ওটা হচ্ছে ঘোর বিষয়ী। এই যে আমরা পথে পথে তীর্থ ক'রে বেড়াচ্ছি এই সময়টা চাষের কাজে লাগালে অনেক ফসল হতে পারত—এই ভাবনাতেই দাদার ঘুম হয় না—সে যাক গে, সবই আমার কপাল। আপনি মেহেরবানি ক'রে একটু খোঁজে থাকবেন, আহা চুমকী আমার মেয়ের বড় পেয়ারের ঘোড়া।

—আচ্ছা ভাই।

লছমন ছত্রী দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রে বিদায় নিল। এখান থেকে বড়কা-খানা মাইল চারেক পথ, খানিকটা দূরে নদী পার হ'তে হবে, তারপর পাহাড়ের হাতছানি দেখতে দেখতে লছমন এক সময়ে বড়কাখানার জংশনে পৌঁছবে।

শক্তিময় আপন কাজে মন দিল।

মন্দ লাগছে না এ জায়গাটা—ঈশ্বর আছেন কি না জানবার জন্যে এখানে কেউ আসবে না, কেউ আসবে না অনুতপ্ত মনে গোপন কথা ভিক্ষার জন্য, আসবে না কেউ আশার প্রাচীরকে সোনা দিয়ে আচ্ছাদিত করবার দাবি নিয়ে। একজন এসেছিল হারানো ঘোড়ার খোঁজে—সেও চলে গেছে। শক্তিময় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একটি শিলাখণ্ডে আরাম করে বসল।

পাথরের কঠিন মসৃণ স্পর্শে কিন্তু আশ্চর্য কোমল একটি হাতের ছোঁয়া লাগল শক্তিময়ের মনে। আচ্ছা, কণিকা ঠিক এখন কি করত? কণিকা যা-ই করুক শক্তিময়ের তাতে কি এসে-যায়? অথচ রোজ সকালে-বিকালে এ ছাড়া তার কিছু জানবার উপায় ছিল না। তাদের সংসারের মোট ওই দু'খানি ঘরে তেরোটি প্রাণীর বাস। তেরো জন—দুটি পৃথক্ পরিবারের মানুষ। বিরাট একটা মানুষের ঢেউ-এ ভেসে এসেছে হাজার-হাজার মানুষ, লাখ-লাখ মানুষ। শক্তিময়ের দাদার শ্বশুরবাড়ির গোটা পরিবার এসে উঠেছে তাদের বাসায়। মাথা গুঁজে থাকাও কষ্টকর। এক-এক জনের মনের গঠন এক-এক রকম। অথচ উপায়ই বা কী! তবু চলে যাচ্ছিল এক রকম ক'রে।

কিন্তু বৌদির বোন কণিকা উঠতি বয়সের মেয়ে। তাকে যে শক্তিময়ের খারাপ লাগে এমন নয়। সাধারণ চেহারা হিসেবে কণিকাকে সুরূপা না বললেও সুশ্রী এ কথা সবাই বলে, শক্তিময়েরও তাতে আপত্তি নেই।...

যেদিন একটা চাকরী জুটল শক্তিময়ের, সেই দিন থেকেই পৃথিবীর মানুষেরা তার প্রতি কেমন অন্য রকম ব্যবহার শুরু করলো। বাইরের জগৎকে শক্তিময় কোনো দিনই তেমন আমল দেয়নি আর বাড়িতে দাদা-বৌদির কাছেও সে কোনো দিন আমল পায়নি। হঠাৎ স্টেট বাসের

কণ্ট্রাক্টরী পেয়ে সে এ-বাড়িতে গণ্য হয়ে উঠ্‌ল—নগণ্যতার খোলসটা কে কেড়ে নিয়েছে কখন শক্তিময় টেরও পায়নি। অভিনবত্বের দিক দিয়ে ভালোই লাগে। ছুটির দিনে দাদা ডেকে পরামর্শ করেন সংসারের অভাব-অনটনের প্রতিকার সম্পর্কে, বৌদি বলেন—'এবার তোমার বিয়ে দেবো।' শক্তিময় বলে —'মনটু-ঝনটুর গতি করো আগে!' বৌদি বলেন—'সে ত তোমার হাতেই রয়েছে।

শক্তিময় অবাক হয়ে তাকায়,—এ বিস্ময়টা তার শ, কারণ তার কানে অনেক কথাই এসে পৌঁছয়, শুনতে ইচ্ছে না থাকলেও শুনতেই হয়। কণিকার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা এবং তার পরিবর্তে বৌদির মেজো ভাই শ্যামলের সঙ্গে মনটুর বিয়ের ঘট্‌কালি চলছিল। এখন শক্তিময়ের দশ দিনের পুরনো চাকরীর ওপর এই ব্যাপারটা পাকাপাকির উপক্রমে এসেছে। বৌদি বল্‌লেন—যেন তুমি ভাজা মাছখানা উল্টোতে জানো না, মনে হচ্ছে। কণির সাথে দিবা-রাত্তির ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর করো যে, তা কি আর কেউ ছাখে নাই?

একটি বেকার ছেলে আর একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে উভয়েই ত পরিবারের সমান গলগ্রহ, এ কথা ত সবাই জানে। তারা যদি দু'জনে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে নিজেদের মনের ভার লাঘব করতে চায়, এর মধ্যে মাছ-ভাজাভাজির কি আছে?

...কিন্তু ছিল। নইলে কণিকা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিত না। নইলে মনটু মুখঝামটা দিয়ে বলতে পারত না—'চিরকাল তোমার লুঙ্গী আর গেঞ্জী কাচার চাকরী আমাকে দিয়ে হবে না। বিয়ে ক'রে বৌ এনে তার ওপর যত পারো হুকুম চালিয়ো।'

শক্তিময়ের মৌন নির্লিপ্ততায় দু'খানা ঘরের বারোটি প্রাণী যেন মানসিক প্রতিরোধ গঠন ক'রে বস্‌ল।

কণিকার ভাঙা-ভাঙা হাতের লেখা এক টুকরো চিঠি খুঁজে পেল সেদিন শক্তিময় তার খাকী শার্টের বুক-পকেটে—"তুমি কি পাষাণ! আমাকে এমন ক'রে ভাসিয়ে দিতে পারবে? কিন্তু একদিন দেখবে আমি এর জবাব

য়ে চলে যাবো—তখন হাজার কাঁদলেও আমাকে ফিরে পাবে না। আর
দশ দিন পরেও যদি তুমি বিয়েতে মত না দাও তা হলে আমি বিষ
খাবো।"...

পাতার ওপর সর্-সর্ শব্দ হ'তেই শক্তিময় চমকে ফিরে চাইল।
একটা গরু। আকাশের রং বদ্‌লেছে। সন্ধ্যা-বন্দনার আয়োজন চলেছে
সারা আকাশে।...শক্তিময়ের মনটা ভারী হয়ে এসেছে। সত্যি সেদিন
ওই এক টুকরো কাগজ থেকে কণিকার মনকে সে ত পড়তে পারেনি।
সারা দিনের দু-আনা, চার পয়সা ছ'পয়সা আর হাওড়া-গোস্তা-মানিকতলা
হাঁকা-হাঁকির পর ঘাম ধুলো বিরক্তির সম্মিলিত ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল কণিকার
চিঠির গুরুত্ব। আসলে লেখাটা কণিকার একান্ত নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত এটাই
শক্তিময় বিশ্বাস করেনি। আরো বারো জনের চক্রান্ত ওই হস্তলিপির পশ্চাতে
দেখতে পেয়েছিল সে। তাছাড়া একটা কথা সে ত ভুলতে পারবে না—
যে দিন কণ্ডাক্টরীর স্বর্গটা শক্তিময় হাতে ধরতে পারেনি ততদিন পৃথিবীর
অন্য সবাই তাকে উপেক্ষা করেছে, করতে পারে তারা, সেটাই স্বাভাবিক।
কিন্তু যে কণিকা শক্তিময়ের প্রেমের কাঙাল হয়ে জীবন বিসর্জনে উদ্যত,
সেও কি ক'রে উদাসীন থাকতে পেরেছিল। তবে কি কণিকাও ওদের মত
পয়সার পূজো করে? শক্তিময়কে ভালোবাসা জানাবার কথা এতদিনে
একবারও মনে হয়নি কেন কণিকার?...জবাব দেয়নি শক্তিময়। বাসের
ঘন্টা বাজিয়ে গাড়ী থামিয়েছে, প্যাসেঞ্জার নিয়ে আবার গাড়ী ছাড়বার ঘন্টা
দিয়েছে। এমনি ক'রে পাঁচটা দিন বেশ কাটল। মাঝে মাঝে শক্তিময়
আপন মনে হেসেছে কণিকার সংকল্পের অসারতা দেখে। বাসায় দু'খানা
ঘরে মানুষ আগের মতই তাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখছে, মাঝে মাঝে তার
আদিখ্যারের জন্যও ত্রুটি হয় না। বৌদি সেদিন শক্তিময়কে খেতে দিয়ে
ভাতের থালার সামনে পাখা হাতে ক'রে গরম ভাতে হাওয়া দিচ্ছিলেন।
শক্তিময় ঘাড় হেঁট করে খেতে খেতে বেশ বুঝতে পারে, এই যত্নের
পশ্চাতে কোন একটা অভিসন্ধি আছে। ইদানীং এই সব ছোটখাট তোষামোদের
ঔদ্ধত্য তাকে পীড়া দেয়,, আবার মানবচরিত্র সম্বন্ধে একটা কৌতুকের

খোরাকও জোগায়। হ'লও তাই, বৌদি মিষ্টিগলায় বল্‌লেন—ঠাকুরপো তুমি এরকম ক্ষেপে বসে থাকলে ত আর চলে না। আমার হয়েছে এক জ্বালা এ দিকে ছেলের বৌ ওদিকেও ঘরের মেয়ে। তোমার দাদার কাছে কিছু বলবার উপায় নেই, আবার ওদিকে মায়ের কাছে কথা শুনতে শুনতে আর কান্না দেখতে দেখতে আমি পাগল হয়ে যাই আর কি!

শক্তিময় হাত গুটিয়ে বসল—কি তুমি বল্‌তে চাও, স্পষ্ট বলো। দুটো ভাত খাবো তাতেও তোমাদের সইবে না?

বৌদি মুখ ভার ক'রে বল্‌লেন—কি এমন বলেছি যে অসহ্য হ'ল ভাই!

—আর কি বল্‌বে। তোমাদের সব জানতে বাকী নেই—কথায় কথায় ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে সুবিধে হ'ল না—এখন শুকনো আদর, পাখার বাতাস দিয়ে—ছিঃ, বৌদি—

ভাত সে খায়নি। উঠে গেল। দু'খানা ঘরের কোথাও যেন এতটুকু প্রাণচিহ্ন ছিল না সেই মুহূর্তে।

আপিসে বেরিয়ে একবার মনে হয়েছিল শক্তিময়ের—চুপ ক'রে থাকাটা ঠিক নয়। প্রতিপক্ষের লোকেরা জানুক যে সে-ও একটা মানুষ। উঃ, কী চক্রান্ত খুলিয়ে তুলেছে সবাই মিলে, বিয়ে হ'লেই যেন সারা জীবনের সব সমস্যা চুকে যাবে! না, সে পারবে না ছা-পোষা হয়ে মরতে মরতে বেঁচে থাকতে।

কিন্তু তার পর?—

দেয়াল থেকে একদানা বালি খসে পড়ার মতই নিতান্ত সহজ ভাবে কণিকা খসে পড়ল জীবনের বিরাট দেহ থেকে। সত্যিই কণিকা আত্মহত্যা করল। সেই দিনই বোধ করি শক্তিময়ের কথার জবাব দিয়ে গেল এই ভাবে। তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরল কণিকা।

শক্তিময় আঘাত পেল—সে আঘাত বড় কি তুচ্ছ তা বুঝে দেখবার মত মনের অবস্থা তার ছিল না, সময়ও কম। কিন্তু একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে।—কণিকার বাবার কাছে দু-একজন নেতার গতায়াত। 'চেনে বই কি' সে এই নেতাদের। খবরের কাগজে একজনের বিবৃতি দেখা গেল—

গভর্ণমেন্টের উদাসীনতার চরম নিদর্শন কণিকার অপমৃত্যু। বাস্তুহারা পিতার অর্থাভাব। সরকার থেকে কোনো রকম সাহায্য না পাওয়ায় পরিবারের সকলকে দীর্ঘদিন উপবাস এবং অর্ধাশনে কাটাতে হচ্ছে। এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরেই কণিকা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। কণিকার এই অপমৃত্যুকে উপলক্ষ্য ক'রে বড় বড় বক্তৃতা হ'ল শহরের আশে-পাশে। শক্তিময়দের ঘর দুখানা সব সময়ের জন্যই লোকজনের গতায়াতে সরগরম থাকে। বাড়ির সকলেই এই মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে অদ্ভুত উচ্ছ্বাসে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। শক্তিময় শুধু চুপ ক'রে থাকে। কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। না বলুক—এতেই সে ভালো আছে।

সত্যি সত্যিই কণিকার অপমৃত্যুর সুযোগে ওদের পরিবারের সুরাহা হয়ে গেল। কোথায় যেন কি একটা চাকরী মিলে গেছে কণিকার বাবার, ওর ছোট ভাইও একটা ব্যবসায়ের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ধার পেয়ে গেল, বসতের জমিও শীগগিরই বিলি-বন্দোবস্তে ওরা পাবে। সংসারে হাসি উথলে উঠল।

আশ্চর্য! কণিকার কথা ওদের মুখে বারেকের জন্যও শোনা যায় না। কণিকা মরে গেছে, কিন্তু শেষ চিহ্নটুকু রেখে গেছে এক জায়গায়। সে চিহ্ন-বহন করতে হচ্ছে শক্তিময়কে। আজও শক্তিময়ের সঙ্গে ওরা কেউ বাক্যালাপ করে না। অদ্ভুত মনে হয়—গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগেও কেউ কথা বলে না শক্তিময়ের সঙ্গে। তবু ভালো যে, কোনো একটা জায়গায় এখনও কণিকার মৃত্যুর আসল কারণটা মিথ্যে যায়নি। শক্তিময়ের দুঃখ হয় না কণিকাকে না পাওয়ার জন্য—কারণ সে ত সত্যিই কণিকাকে কামনা করেনি? কিন্তু কণিকা মরে যাওয়াতে তার কষ্ট হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এই ধোঁয়ার কালিতে বিষম আবহাওয়াতে খুবই কষ্ট হ'য়েছে, জ... করেছে মনের মধ্যেটা এদের অবিচার আর বিরূপতায়, তবু শক্তিময় ক'রে গেছে। কোনো দিন একটি কথাও বলেনি সে মুখ ফুটে। প্রতি... করা তার স্বভাব নয়! কণিকার মৃত্যু যেন তাকে আরও মূক... ক... দিয়েছে। সে শুধু বাসের টিকিট কাটে আর বিড়ি খায়, বন্ধুদের রসিকতায় নীরবে যোগ দেয় আর বাড়িতে যতক্ষণ থাকে বোবা হয়েই কাটায়

হয়ত এই ভাবেই চলত। কিন্তু সেদিন যখন শুনল, কণিকার বাপ বেশ জোর-গলায় তার দাদাকে বলছেন—আমার আর বুঝতে বাকী নাই তোমার ভাই-এর মত চামাররে জামাই করতে ইচ্ছা ছিল না, অখনেও নাই—তবে তোমরা বার বার বলো তাই। ওর তো টাকা নগদ চাই পাঁচশ, এই জন্যে না এত কথা! তা দিমু যাও। মণিকার জন্য অবিশ্যি ভাবনা ছিল না, রূপে-গুণে রাজরাণী হওনের যোগ্য এই মেয়ে! তোমার ভাইর চেয়ে আমার মেজো ছেলে ত কম রোজগার করে না, না হয় কাটাকাপড় বিক্রীর টাকা। আরে টাকা আনে ত বটে! যাউক গিয়া। ব্যাপারটা মিটাইয়া নিলেই হয়। তারে কও গিয়া পাঁচশ' টাকাই পাইবে সেই হতভাগা! অর্থাৎ কণিকার ছোট বোন মণিকার সঙ্গে শক্তিময়ের বিয়ের সম্পর্ক হচ্ছে, পাঁচশ' টাকা নগদও দিতে রাজী ওঁরা, মন্টুর সঙ্গে ওই ফেরীওয়ালা ছোকরার বিয়ে দিতে হবে, কারণ সে ছোকরাও পাত্র হিসেবে শক্তিময়ের চেয়ে খারাপ নয়। বাঃ!

এর পর শক্তিময় যদি রামগড়ে বন্ধুর কাছে পালিয়ে এসে থাকে ত তাকে দোষ দিতে হবে বই কি! একসঙ্গে দু'দুটো কন্যাদায় উদ্ধারের সম্ভাবনা আপাততঃ ঘুচিয়ে দিয়েছে যে মূঢ় তাকে সামাজিক হওবিধি অনুসারে শাস্তি দেওয়া কি উচিত নয়? শক্তিময়ের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল মণিকার বাবা, কলকাতা শহর থেকে তিনশ' মাইল দূরের এই পাহাড় জঙ্গলে হঠৎ কি ক'রে এমন একটা বিপর্যয় ঘট্‌ল? পৃথিবীর কোথাও পালিয়েই কি নিস্তার নেই তবে?

চম্‌কে উঠল শক্তিময়। নিজের ভুল ভেঙে, আপন-মনেই সে বনের মধ্যে একা-একা হাসতে লাগল—অবাধ প্রাণখোলা হাসিতে আর তার প্রতিধ্বনিতে পাহাড়টা গম্‌ গম্‌ করতে লাগল। আর কিছু নয়—একটা ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে তার সাম্‌নে। হয়ত ঘোড়াটা সেই লছমনের। তা হোক, শক্তিময় কিছু বল্‌লে না তাকে। বেচারী অনেক মোট বয়েছে। অনেক তীর্থের পথে-পথে কত বোঝা বয়েছে। এখন ছাড়া পেয়েছে—ছাড়াই থাক। শক্তিময় জানাবে না লছমনকে।

সমাপ্ত